সুমন্ত আসলাম

রাতুল দ্যা গ্রেট

SUPERIOR SUNY BOILOVERS.COM

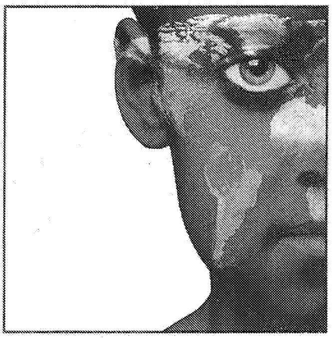

বাসা থেকে বের হয়েই কাঁদতে থাকে রাতুল। কারণ মারাত্মক একটা অসুখ আছে তার—দু-তিন ঘণ্টা পর পর সব কিছু ভুলে যায় সে। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সায়ন্তের সঙ্গে। ছেলের বয়সী রাতুলকে রেখে চলে যেতে পারেন না তিনি, দায়িত্ব হিসেবে তার বাসা খুঁজতে থাকেন তাকে নিয়ে। রাতুলের কথা মতো চিড়িয়াখানায় যান, শিশুপার্কে যান, যাদুঘরে যান—কোথাও বাসা খুঁজে পাওয়া যায় না রাতুলের। এরই মধ্যে মারামারি কপাল ফাটিয়ে ফেলে সে!

মারাত্মক একটা বিপদে পড়ে যায় মিমনির বাবা সাদাত। রাস্তায় একটা মৃত মানুষ পেয়ে থানায় নিয়ে আসেন তিনি। মৃতের পকেটে পাওয়া মোবাইল থেকে ফোন করেন তিনি ওই মৃত মানুষটার একজনকে। তিনি আসার পর ঝামেলা আরো বেড়ে যায়, ভীষণ ঝামেলা! কিন্তু মিমনি এসবের কিছুই বুঝতে চায় না, সে আছে অংক নিয়ে, কঠিন কঠিন সব অংক। কারণ দুদিন পর গণিত অলিম্পিয়াডে যোগ দেবে সে!

মেয়ে টুনিকে নিয়ে একটা ব্যাক ক্যাবে করে যাচ্ছেন মিথিলা, টুনির বাবার নাকি কী হয়েছে! কিন্তু টুনি আছে প্রশ্ন নিয়ে, একটার পর একটা প্রশ্ন করতে থাকে সে। মিথিলার ছেলে ইফতি স্কুল থেকে বাসায় ফিরে, বাসা থেকে বের হয়ে যায় আবার। অথচ মা ফোন করলে মাকে বলে, বাসায়ই আছে সে। দুষ্টমিতে কেটে যায় তার সারাদিন।

কিন্তু অবশেষে জানা যায় আসল রহস্য! অদ্ভুত মজার রহস্য, ভীষণ আনন্দেরও। রাতুল, মিমনি, টুনির দেখা হয়ে যায় এক সঙ্গে, একই স্থানে। ইফতি তখন অন্য এক জায়গায়, অন্য ভাবে!

BoiLovers.com
Present

Book is free for all

Contact

www.boilovers.com

www.facebook.com/SuperiorSuny

01843-456129

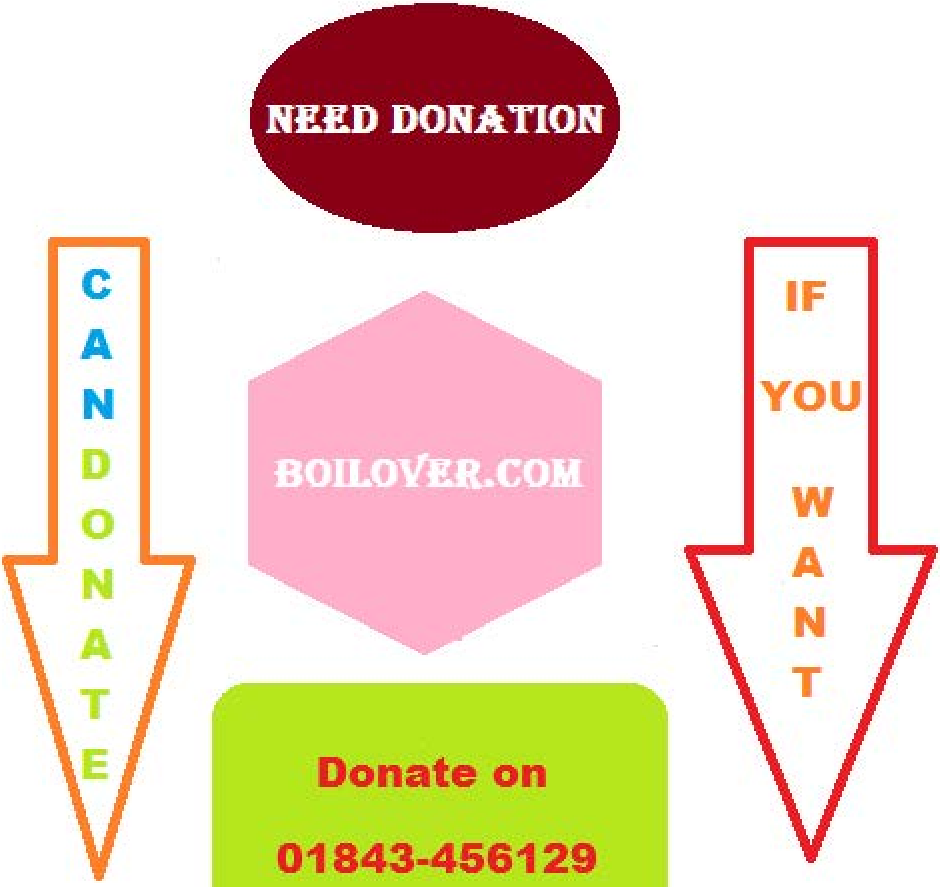
NEED DONATION
CAN DONATE
BOILOVER.COM
IF YOU WANT
Donate on
01843-456129

সব কিছুই সে ভালো লেখে—ক্রীড়া প্রতিবেদন, উপন্যাস, গল্প, নাটকও। তার লেখার মাঝে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সরলতা আছে, আছে মজাও। মুগ্ধ হয়ে পড়েন অনেকে, আমিও।

প্রিয় মামুন, প্রিয় মোস্তফা মামুন

তুমি কি জানো, তোমার সব ভালো গুণের চেয়ে বড় গুণ হচ্ছে—তুমি নিজে একজন ভালো মানুষ!

কী ভাবতে হবে, এটা নয়; বরং বাচ্চাদের শেখানো উচিত—
কীভাবে ভাবতে হয়।

—মার্গারেট মিড, আমেরিকান কালচারাল অ্যানথ্রোপোলজিস্ট

বাসার বাইরে বের হয়ে বেশ কিছুদুর যেতেই কপালটা হঠাৎ চেপে ধরল ছেলেটি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে তার। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন পাত্তা দিচ্ছে না সে। একটু থমকে দাঁড়িয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল আবার। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারল না। সে টের পেল, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে তার, মাথার ব্যথাটাও বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। শেষ পর্যন্ত ব্যথাটা এত তীব্র হলো যে, ফুটপাতের একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল সে কষ্টে।।

রাস্তা পার হচ্ছিলেন সায়ন্ত। প্রচুর গাড়ি। কোনোরকমে পার হয়ে এপাশে আসতেই চোখ গেল তার ছেলেটির দিকে। এগার-বারো বয়স, তার নিজেরও এ বয়সী একটা ছেলে আছে। নিজের ছেলের কথা মনে হতেই এগিয়ে গেলেন তিনি কাঁদতে থাকা ছেলেটির দিকে। ভালো করে তাকে দেখলেন—সুন্দর পোশাক গায়ে তার, পায়ের জুতো জোড়াও চকচক করছে, মাথাটাও পরিপাটি করে আঁচড়ানো। কেবল চোখের কোনায় ময়লা লেগে আছে একটু।

সায়ন্ত আরো একটু এগিয়ে গেলেন ছেলেটির দিকে। আরো ভালো করে তাকালেন। ছেলেটা একমনে কাঁদছে। পাশ দিয়ে অনেকেই হেঁটে যাচ্ছে, কেউই তেমন ফিরে তাকাচ্ছে না তার দিকে। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ছেলেটির পাশে, নিজের ছেলে মনে করে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

ছেলেটির কাঁধে একটা হাত রাখলেন সায়ন্ত। কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বুঝতে পারলেন না কিছুই। এ বয়সী ছেলেরা সহজে কাঁদে না। বাসার ভেতরে তো নয়ই, বাসার বাইরেও না। কিন্তু এ ছেলেটা নির্দ্বিধায় কাঁদছে, ঝরঝর করে পানি পড়ছে তার চোখ দিয়ে।

ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল সায়ন্তের। কঁধে হাত রেখেই নরম গলায় বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন, বাবু?'

কাঁদতেই কাঁদতেই ছেলেটি বলল, 'আমি আমার বাসা হারিয়ে ফেলেছি।'

'বাসা হারিয়ে ফেলেছ! কীভাবে!' বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল সায়ন্ত।

'আমার একটা অসুখ আছে—তিন-চার ঘণ্টা পরপর সব কিছু ভুলে যাই আমি। কিছুই মনে থাকে না তখন!'

'বলো কি!' সায়ন্ত ছেলেটার কাঁধটা আরো একটু জোরে চেপে ধরে বলল, 'বাসা থেকে বের হয়েছিলে কেন তুমি?'

কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করল ছেলেটি। মনে করতে পারল না। মাথা এদিক-ওদিক ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'এটাও আমি ভুলে গেছি।'

'আবার একটু মনে করার চেষ্টা করো।'

'মনে আসবে না। হাজার চেষ্টা করলেও আসবে না। অসুখ আছে না আমার একটা!' দুঃখী দুঃখী গলায় বলল ছেলেটি।

'তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

'তা তো বুঝতে পারছি না। তবে পেটে একটু একটু ব্যথা করছে।'

'তাহলে তো খিদে পেয়েছে তোমার। কখন না কখন খেয়েছ তুমি!' হাত ঘড়ির দিকে তাকাল সায়ন্ত, 'এখন তো সকাল দশটা বাজে। নাস্তা করেছিলে?'

ঠোঁট উল্টাল ছেলেটি, 'কী জানি, এটাও মনে নেই আমার।'

'পেট খালি রাখা তো অসুবিধা!' রোদ এসে গায়ে লাগছে ছেলেটির। গাছের ছায়াতে এনে সায়ন্ত বলল, 'ভালো কথা, নাম কি তোমার?'

'নাম?' ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাল, নাম মনে করার চেষ্টা করছে সে। এবারও ব্যর্থ হলো। কিছুটা অপরাধী গলায় সে বলল, 'স্যরি আংকেল, টোট্যলি আই হ্যাভ লস্ট মাই মেমোরি।'

ইংরেজি বাক্যটা শুনে মুগ্ধ হলো সায়ন্ত। তার ছেলেও এভাবে ইংরেজি বলে। খুব চমৎকার উচ্চারণে বলে। রেগে গেলে আরো বেশী বলে। সম্ভবত এ ছেলেটাও তার ছেলের মতো ভালো ছাত্র, বুদ্ধিমানও। ছেলেটার ভুলে যাওয়া রোগ আছে। এ রোগটা সম্পর্কে তিনি এর আগে কোথায় যেন শুনেছেন। কী যেন নাম রোগটার? মনে করতে পারলেন না সায়ন্ত। তার খুব ইচ্ছে করছে ছেলেটার রোল নম্বর জিজ্ঞেস করতে। তার ছেলের বয়সী কোনো ছেলে দেখলেই দুটো জিনিস জিজ্ঞেস করেন তিনি—এক. কোন ক্লাসে পড়া হয়, দুই. রোল কত তার।

ছেলেটি হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বলল, 'নামটা একটু একটু মনে পড়ছে আমার। আচ্ছা, সবচেয়ে ভালো ক্রিকেট খেলে কে যেন এখন?'

'কোন দেশের?'
মাথা এদিক ওদিক করতে করতে ছেলেটি বলল, 'মনে নেই।'
'ভারতের?'
মাথা একদিকে কাত করল এবার সে, 'হতে পারে।'
'তাহলে তো শচিন টেণ্ডুলকার।'
'না না, ওরকম নাম না আমার।'
'তাহলে শেবাগ?'
'না, ওটাও না। ভালো কথা—।' ছেলেটি একটু থেমে বলে, 'ভারতের পাশের দেশটার নাম যেন কী?'
'পাকিস্তান।'
'পাকিস্তানের কয়েকটা খেলোয়াড়ের নাম বলুন তো?'
'শোয়েব আখতার, শহীদ আফ্রিদি, আসিফ ইকবাল—।' হাত দিয়ে ইশারা করে সায়ন্তকে থামিয়ে দিল ছেলেটি, 'না, ওগুলোও না। দাঁড়ান দাঁড়ান, কয়েকদিন আগেও কে যেন সবচেয়ে ভালো টেনিস খেলত?'
'রাফায়েল নাদাল।'
'ইয়েস। আমার নামের আগে রা আছে।'
'রাশেদ তোমার নাম?' কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বলেন সায়ন্ত।
'না।'
'রাকিব?'
'না।'
'রাজীব?'
'না।' ছেলেটি হঠাৎ লাফ দেওয়ার মতো করে বলল, 'রা রা...।' সঙ্গে সঙ্গে সায়ন্ত বললেন, 'বলো বলো। রা রা—।'
সায়ন্তকে চমকে দিয়ে ছেলেটি বলল, 'রাতুল, রাতুল আমার নাম।'
শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন সায়ন্ত। আলতো করে ছেলেটার কাঁধটা আবার ধরে তিনি বললেন, 'খুব সুন্দর নাম তোমার, রাতুল।'
পেটে হাত রাখল রাতুল। তাই দেখে সায়ন্ত বেশ উদগ্রীব হয়ে বললেন, 'পেটে কি এখনো ব্যথা করছে তোমার? সম্ভবত সকালে তুমি খাওইনি। পেট খালি, সেজন্য ব্যথা করছে। চলো, তোমাকে কিছু খাইয়ে আনি। তোমার এখন খাওয়া দরকার। কী খাবে?'
'কোনো কিছু তো বুঝতে পারছি না, আংকেল?'

'কী পছন্দ তোমার-বার্গার, চিকেন ফ্রাই, না পিজা?'

'আমার মনে হয় আমি আইসক্রিম খেতে পছন্দ করি।' বুদ্ধিজীবীর মতো শান্ত গলায় বলল রাতুল।

'খালি পেটে তো আইসক্রিম খাওয়া ঠিক হবে না। আগে অন্য কিছু খাও, তারপর আইসক্রিম খাবে।' রাতুলের একটা হাত ধরে সায়ন্ত বলল, 'চলো, সামনে একটা হোটেল দেখতে পাচ্ছি। তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা খাবে, পেট ভরে খাবে।'

রাতুল খুব আনন্দ আর মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। সামনে বসে তা দেখছেন সায়ন্ত। তার ছেলেও ঠিক এভাবে খাওয়া-দাওয়া করে। চিকেন তার খুব পছন্দ, লেগ পরশন হলে আরো বেশি পছন্দ। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খাওয়া ভুলে কী যেন ভাবে সে, রাতুলও ভাবছে। খারাপ হয়ে যাওয়া মনটা একটু একটু ভালো হচ্ছে সায়ন্তের। খেতে একটু সময় নিচ্ছে ছেলেটি, নিক। ইচ্ছে করেই তাকে সময় দিচ্ছেন সায়ন্ত। কী জানি, খাওয়া শেষ হওয়ার পরপরই সব কিছু মনে পড়ে যেতে পারে তার!

দু টুকরো চিকেন, একটা মাঝারি বার্গার, একটা চকলেট পেস্ট্রি শেষ করতেই সায়ন্ত বলল, 'আর কিছু খাবে?' তার ছেলেকেও তিনি মাঝে মাঝে বাইরে এনে খাওয়ান। বেশ কিছু জিনিস খাওয়ানোর পর তিনিও এভাবে আর কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞেস করেন ছেলেকে।

রাতুল ছোট্ট করে একটা ঢেকুর ছেড়ে বলল, 'আইসক্রিম খাব।'

'কোন আইসক্রিম পছন্দ তোমার—ভ্যানিলা, চকলেট, না স্ট্রবেরি?'

'এটাও তো ভুলে গেছি! তবে একটু একটু মনে হচ্ছে—আমি সম্ভবত মিক্সড আইসক্রিম পছন্দ করি।'

পুরো এককাপ মিক্সড আইসক্রিম অর্ডার দিলেন সায়ন্ত। সঙ্গে সঙ্গে রাতুল বলল, 'আংকেল, আমিই তো কেবল খাচ্ছি। আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না!'

'ঘণ্টা খানেক আগে আমি নাস্তা খেয়েছি। অফিসে এসে কফি খেয়েছি এক কাপ। পেটে আর জায়গা নেই।। তুমি খাও, তোমার খাওয়া দেখে ভালো লাগছে আমার।' বেয়ারা আইসক্রিম এনে রেখেছে টেবিলে। সায়ন্ত সেটা রাতুলের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এগুলো শেষ করে আরো যদি খেতে ইচ্ছে করে, বোলো।'

খুব স্টাইল করে চামিচ দিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে রাতুল। ছেলেটা সত্যি

অভিজাত কোনো বংশের। বাসা থেকে কখন যে বের হয়েছে! এখনো ফিরে যায়নি দেখে না জানি কী করছেন ওর বাবা—মা। অসুস্থ ছেলে, চিৎকার করে কান্নাকাটি করছে সম্ভবত সবাই।

খাওয়া শেষে বেয়ারা বিল নিয়ে আসতেই রাতুল খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল, 'আংকেল, আমার কাছে টাকা আছে।' পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে টেবিলে রাখল সে, 'এ দুটো নোট আছে আমার। হবে না?'

হেসে ফেলল সায়ন্ত। নোট দুটো রাতুলের হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'পকেটে রেখে দাও।' তারপর মানিব্যাগ বের করে চারশ ষাট টাকা বিল মেটানোর জন্য পাঁচশ টাকার একটা নোট দিলেন তিনি বেয়ারার হাতে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে রাতুলকে সাথে নিয়ে আরো কিছুক্ষণ এদিক সেদিক হাঁটলেন সায়ন্ত। যদি কোনো বাসা দেখে নিজের বাসা চিনে ফেলে রাতুল! জরুরী একটা কাজে অফিস থেকে বের হয়েছেন তিনি, তাও তো ঘণ্টা খানেক হয়ে গেল! অফিসে ফেরা দরকার। যদিও তিনি না ফিরলে কেউ কিছু বলবে না, তবু দায়িত্ব বলে কথা আছে না! আবার এই ছেলেটাকেই বা ছেড়ে যান কীভাবে তিনি! অসুস্থ এই ছেলেটাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়াও তো একটা দায়িত্ব। ব্যাপারটা মানবিক, আত্মিকও। এরকম একটা ছেলে আছে না তার! যদি কোনো খারাপ এবং দুষ্টু লোকের পাল্লায় পড়ে সে! ভয়ানক বিপদ হবে তখন। আজকাল কী সব কিডনী-মিডনীর ব্যবসা হচ্ছে, পঙ্গু করে ভিক্ষাবৃত্তিও করায় অনেকে, বাইরের দেশে পাচারও করে দেয় অনেককে। বুকের ভেতরটা ঝট করে কেঁপে ওঠে সায়ন্তের। না, এই ছেলেটাকে তার বাসায় পৌঁছে না দিয়ে ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ছেলেটাকে ছেড়ে যাওয়া অনৈতিক হবে, বুকের ভেতরটাও পোড়াবে।

আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর সায়ন্ত বললেন, 'রাতুল, এবার একটু মনে করার চেষ্টা করো তো। বাসার কথা মনে পড়ে কিনা তোমার!'

থমকে দাঁড়ায় রাতুল। গভীর চিন্তাযুক্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকায়। তাকে দেখ মনে হচ্ছে, নতুন একটা পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছে সে আকাশে, কোনো দুই কিংবা চার পাওয়ালা মানুষ আছে কিনা, তার অনুসন্ধান করছে সেখানে গভীরভাবে।

রাতুলকে ভাবার সময় দিল সায়ন্ত। বেশ কিছুক্ষণ পর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই সে কিছুটা শব্দ করে বলল, 'আংকেল, বাসার কথা একটু একটু মনে পড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। আমাদের বাসার পাশে বাঘ আর সিংহের বাসা। হরিণের বাসাও।'

'কী!' সায়ন্ত চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, 'তোমাদের বাসার পাশে বাঘ-সিংহের বাসা! এটা কী বলছ তুমি!'

'আমার তো সেরকমই মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে আমাদের বাসার ভেতর থেকে যে আমি সিংহের ডাক শুনতে পাই, বাঘেরও।'

বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন সায়ন্ত। ঢাকা শহরে কারো বাসার পাশে বাঘ—সিংহের বাসা আছে কিনা, তা জানা নেই তার। ছেলেটা পাগল কিছিমের না তো! কই সেরকম কিছু মনে হয়নি এতক্ষণ। সুবোধ এবং ভদ্রছেলের মতো খেয়েছে, হেঁটেছে, সব কথার জবাব দিয়েছে।

সায়ন্তের হঠাৎ চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়ল। রাতুলের একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'রাতুল, একটু মনে করার চেষ্টা করো তো—বাঘ-সিংহের বাসার সামনে মানুষজন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিনা?'

আবার ভাবতে শুরু করল রাতুল। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন সায়ন্ত। ভাবতে ভাবতে ঠোঁট কামড়াতে শুরু করেছে সে। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঘ-সিংহের বাসার সামনে সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বড়রা থাকে, ছোটরাও থাকে। আমার বয়সীও অনেক ছেলে—মেয়ে থাকে। তারা সিংহের দিকে ঢিল ছোড়ে। বানরের বাসার সামনে গিয়ে বানরকে ভেংচি কাটে।'

চেহারাটা হাসি হাসি হয়ে গেল সায়ন্তের। যাক, অবশেষে বোঝা গেল চিড়িয়াখানার আশেপাশে রাতুলদের বাসা। ওখানে ওকে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেই বাসাটা চিনে ফেলতে পারবে ও।

রাতুলের হাতটা ভালো করে চেপে ধরলেন সায়ন্ত। তারপর একটা ব্ল্যাক ক্যাব ডেকে বললেন, 'চিড়িয়াখানার কাছে যাবেন? মিটারে যা উঠবে একশ টাকা বেশী পাবেন তার চেয়ে।'

রাজী হয়ে গেলেন ক্যাব চালক। রাতুলকে নিয়ে উঠে পড়লেন সায়ন্ত। একশ টাকা এখানে কোনো বিষয় না, ছেলেটাকে দ্রুত বাসায় পৌঁছে দেওয়াটা জরুরী। না জানি, কী হয়ে যাচ্ছে ওর ফ্যামিলিতে!

খুব মনোযোগ দিয়ে রান্না ঘরে একটা টুলে বসে বই পড়ছেন মিথিলা। বইয়ের নাম—হাসতে হাসতে রান্না শিক্ষা। কিন্তু হাসি আসছে না, বরং মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার। রেসিপি দেখে সেই সকাল থেকে দই বড়া বানানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। বড়াটা বার বার ভেঙ্গে যাচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কি করতে হবে, তার কোনো কিছুই উল্লেখ নেই বইতে।

বইটা বন্ধ করে ভেঙ্গে যাওয়া বড়াগুলোর দিকে হতাশ চোখে তাকালেন মিথিলা। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনে মনে ভাবলেন, এগুলো দিয়ে ভর্তা বানাতে হবে, আপাতত আর কোনো উপায় নেই এ ছাড়া।

মিথিলার সাড়ে তিন বছরের মেয়ে টুনি শুরু থেকেই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আছে রান্না ঘরে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মায়ের কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে সে। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে এটা তার কাছে পরিষ্কার, কিন্তু সমস্যাটা কি, ধরতে পারছে না তা। ব্যাপারটা নিয়ে সেও চিন্তিত। সে অনেকদিন খেয়াল করেছে, মেজাজ খারাপ হলে মামনি তার চোখ চুলকায়, বার বার চুলকায়। আজও চোখ চুলকাচ্ছে। তাহলে কি মামনির মেজাজ খারাপ! ঠিক বুঝতে পারছে না সে।

কিছুটা চিন্তাযুক্ত হয়ে টুনি এগিয়ে গেল মামনির দিকে। তারপর সুযোগ বুঝে বলল, 'মামনি, আমি কি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

মেয়ের কথা শুনে হেসে ফেললেন মিথিলা। এতটুকু মেয়ের কী পাকা পাকা কথা! টুনির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, মা। যাও, ড্রইং রুমে গিয়ে তোমার খেলনা নিয়ে খেলা করো।'

'এই সময় আমার খেলাধূলা করতে ভালো লাগে না, মামনি।' বিজ্ঞের মতো না সূচক মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দিল টুনি।

'তা হলে এই সময়টাতে তোমার কি করতে ইচ্ছে করছে?'

'তোমাকে সাহায্য করতে ইচ্ছে করছে।' বেশ গম্ভীর ভাবে বলে চলল টুনি, 'আমি খেয়াল করে দেখেছি, তুমি অনেক কিছুই পারো না। কিন্ত আমি পারি। আমি তোমাকে অনেক কিছু শেখাব, মামনি।'

মেয়ের কথায় অবাক হলেন মিথিলা। মনে মনে ভাবলেন, কথায় বেশ পটু হয়েছে মেয়েটা, ঝটপট কথা বলে ফেলে সে। একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ের মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, 'আচ্ছা! একজন সাহায্যকারী পাওয়া গেল তাহলে। আমি তো দই বড়া বানাচ্ছিলাম, কিন্তু পারছি না। তুমি কি আমাকে দই বড়া বানানো শেখাবে?'

দইবড়ার কথা শুনে কপাল কুঁচকে ফেলল টুনি। তারপর কৌতূহলী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো, 'দইবড়া কি, মামনি?'

'এটা একটা খাবার। খুব মজার খাবার, সবাই মিলে খেতে হয়।'

'কেন খেতে হয়, মামনি?'

'খেতে মজা লাগে যে, তাই।'

'খেতে মজা লাগে কেন?'

'এমনি এমনি মজা লাগে, মা।'

মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে নিয়ে থেমে গেলেন মিথিলা। একবার প্রশ্ন করা শুরু করলে আর থামার নাম নেই। প্রশ্ন করা দেখে মনে হচ্ছে সেদিকেই যাচ্ছে টুনি!

'এমনি এমনি কেন মজা লাগে, মামনি?' আবার প্রশ্ন ছুড়ে মামনির দিকে প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকায় টুনি। উত্তরের অপেক্ষা করছে সে। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তরটা জানা তার জন্য খুব জরুরী, যেন সামনে তার পরীক্ষা, পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটা আসতে পারে!

মিথিলা মেয়েকে হতাশ করে বললেন, 'মা, আর কথা বলে না। খেলতে যাও। আমি কাজটা শেষ করেই তোমার কাছে আসছি। তোমার সাথে আমিও খেলবো। কেমন?'

'এখানে আরো একটু থাকি না, মামনি।'

রেগে যেতে নিয়েই থেমে গেলেন মিথিলা। দইবড়া না বানাতে পেরে বেশ গরম হয়ে গেছে মাথা। নিজেকে শান্ত করে তিনি বললেন, 'এখানে থেকে তুমি কি করবে, বলো!'

'বললাম না, তোমাকে অনেক কিছু শেখাব আমি।'

'কী শেখাবে তুমি?' মাথাটা গরম হয়েই আছে মিথিলার।

'অনেক কিছু।'

'এখন শেখানোর দরকার নেই, পরে শিখিয়েও আমাকে, ওকে?'

'পরে কেন, মামনি?'

'আমি এখন ব্যস্ত তো।'

'ব্যস্ত কেন তুমি?'

হেসে ফেললেন মিথিলা। মেয়েকে কোলে নিয়ে চুমুও খেলেন একটা। জড়িয়েও ধরলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু মনটা খারাই হয়ে আছে। দইবড়া না বানিয়ে তিনি আজ অন্য কাজ করবেন না। মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে মিথিলা বললেন, 'মামনি, তুমি যদি এখন খেলতে না যাও, আমি কিন্তু তাহলে আল্লার কাছে চলে যাব!'

বেশ ভয় পায় টুনি এ কথাটা শুনে। মামনি মাঝে মাঝেই এ কথাটা বলে তাকে। শুনতে ভালো লাগে না তার। মাথা নিচু করে মায়ের হাত ছেড়ে চলে যায় তাই ড্রইংরুমে। মেঝেতে পড়ে থাকা টাক মাথার পুতুলটার সামনে বসে কী যেন ভাবে। তারপর পেটে চাপ দেয় সে কিছুটা রাগ নিয়েই। পুতুলটা কেঁদে ওঠে শব্দ করতে থাকে-মামমাম মা, মামমাম মা...।

ড্রইংরুমে মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মিথিলা। দইবড়াটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ইফতি স্কুলে যাবার আগে বার বার দইবড়ার কথা বলে গেছে। ছেলেটা ভাত—টাত একেবারেই খেতে চায় না। শুধু এটা খাবে, ওটা খাবে। গতকাল স্কুল থেকে ফিরে ও বায়না ধরেছিল, দইবড়া খাবে। স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে তার বন্ধু রাসেল দইবড়া খেয়েছে। সেটা দেখেই দইবড়া খাবার শখ চেপেছে তার। না পেলে রেগে—টেগে একেবারে অস্থির হয়ে যাবে সে।

মাস তিনেক আগে একবার স্কুল থেকে ফিরে ইফতি বলেছিল, 'মামনি, আজ তুমি আমাকে চিকেন পাকুরা বানিয়ে খাওয়াবে।' মিথিলা বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, খাওয়াব।' বিকেলে পাশের বাসার ভাবী কী একটা কাজে বাসায়

আসায় ভুলে গিয়েছিলেন পাকুরা বানাতে। রাতে খাওয়ার সময় মিথিলা তাকে ভাত খেতে বলায় সে গম্ভীর মুখে বলেছিল, পেট ভরা তার, খাবে না সে। সকালে উঠেও সে একই কথা বলে। মিথিলা ভেবেছিলেন, পেটের কোনো সমস্যা হয়েছে ইফতির। স্কুল বন্ধ ছিল সেদিন। এক গ্লাস শরবত বানিয়ে ইফতিকে খেতে বলেছিলেন তিনি। না খেয়ে ইফতি ওই একই কথা বলেছিল। চিন্তায় পড়ে যান মিথিলা। কী হলো ছেলেটার! হঠাৎ গতকালের কথা মনে পড়ে যায় তার—ইফতি চিকেন পাকুরা খেতে চেয়েছিল কাল স্কুল থেকে ফিরে! দ্রুত ফ্রিজ থেকে বরফ—জমাট মাংস বের করে, সেই বরফ গলিয়ে, মাংস ছাড়িয়ে, পাকুরা বানাতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগেছিল! কিন্তু ছেলের সামনে আনতেই মুখ ফিরিয়ে নেয় সে। মিথিলা অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'কী হলো, খাও।'

'না, আজ খাব না।'

'কেন!'

'আমি কাল খেতে চেয়েছিলাম!'

'স্যরি বাবা, ভুলে গিয়েছিলাম আমি।'

'নো প্রবলেম।' ইফতি সামনে রাখা পাকুরার প্লেটটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'কিন্তু তুমি হাজার বললেও আমি আজ খাব না।'

'লক্ষ্মী বাবা আমার, স্যরি বললাম না!'

'আমিও স্যরি, আমি আজ খাব না।'

মিথিলা সত্যি সত্যি সেদিন পাকুরা খাওয়াতে পারেননি ইফতিকে। খুব মন খারাপ হয়েছিল সেদিন। ছেলেটা এমনিতে কিছু খেতে চায় না। যা চায়, সেটা দিতে না পারলে একেবারে জেদী হয়ে ওঠে। যতই বড় হচ্ছে সে, ততই যেন জেদ বেড়ে যাচ্ছে তার।

হাসতে হাসতে রান্না শিক্ষা বইটা হাতে তুলে নিলেন মিথিলা আবার। দই বড়ার উপাদানগুলোতে আরেকবার চোখ বুলালেন—কাঁচা মাষকলাই ডাল আধা কাপ, চিনি ২ টেবিল চামচ, টক দই ৪ কাপ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো, বিট লবণ ১ চা চামচ, পুদিনাপাতা বা ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ। সবই তো ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে না কেন?

নতুন করে সব কিছু শুরু করবেন বলে ঠিক করলেন মিথিলা। এমন সময় বেডরুম থেকে ফোন বাজার শব্দ শুনলেন তিনি। দেরি না করে হাত ধুয়ে

এগিয়ে গেলেন বেডরুমের দিকে। বিছানার ওপর পড়ে থাকা মোবাইলটা হাতে নিলেন। অচেনা নাম্বার। তবুও রিসিভ করলেন তিনি ফোনটা। ওপাশ থেকে সালাম দিয়ে খুব মোলায়েম গলায় একটি মেয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, আমি হাউস কেয়ার এন্ড সার্ভিস কোম্পানি থেকে বলছি। আপনার বাসায় নিশ্চয়ই কোনো কাজের মানুষ প্রয়োজন?'

'অলরেডি কাজের মানুষ আছে আমার।'

'নিশ্চয় পার্মানেন্ট না।'

'পার্মানেন্ট কাজের মানুষ পাব কোথায়!'

'ইগজ্যাক্টলি। আপনার এ সমস্যার সমাধানের জন্যই আমাদের কোম্পানি। আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে প্রতিদিন সকাল সাতটায় একটা কাজের মানুষ যাবে আপনার বাসায়, কাজ শেষ করে চলেও আসবে ঠিক রাত সাতটায়। এর মধ্যে সে আপনার সংসারের যাবতীয় কাজ করে দেবে।'

'এর জন্য মাসে আমাকে কত দিতে হবে?'

'তার আগে আপনার কী কী সুবিধা হবে সেটা একটু বলি। এক. ঘন ঘন গ্রামের বাড়ি যাওয়ার আবদার তার কাছ থেকে পাবেন না, দুই. দুপুর হলেই বাংলা সিনেমা দেখার জন্য টিভির সামনে বসে থাকতে চাইবে না সে, তিন. ফ্রিজ থেকে কিংবা রান্নাঘর থেকে কোনো খাবার জিনিস মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা নেই, চার. বারবার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের মানুষের দিকে তাকাবে না, পাঁচ. ময়লা ফেলার জন্য গেটের বাইরে গিয়ে অন্যান্য কাজের মেয়ের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠবে না, ছয়. আশপাশের কেউ লোভ দেখিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, সাত. পালিয়ে যাওয়ারও কোনো ভয় নেই, থানা—পুলিশেরও তাই ঝামেলা নেই, আট. প্রতিদিন-।'

মিথিলা তাকে থামিয়ে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, আপনাদের সুবিধা অনেক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি আপু, আমার যে বুয়াটা আছে, আপনি যে এতক্ষণ সমস্যাগুলোর কথা বললেন, তারও এরকম কোনো সমস্যা নেই।'

'ম্যাডাম, আপনার বুয়াটা কি খুব পরিষ্কার?'

'পরিষ্কার—অপরিষ্কার বুঝি না। বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সাবান দিয়ে তিনবার তার হাত ধুইয়ে নিই।'

'তার স্বাস্থ্যের অবস্থা?'

'আপনি নিশ্চয় বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মতো স্বাস্থ্য আশা করেন না তাদের! মোটামুটি আছে।'

'শরীরের রোগবালাই?'

'শরীরে রোগবালাই কার নেই? আপনি কি আপনার শরীর সমন্ধে সম্পূর্ণভাবে জানেন? কতরকম অসুখ গোপনে বাসা বেধে থাকে না শরীরে!'

'কিন্তু ম্যাডাম— ।'

মেয়েটাকে থামিয়ে দেন মিথিলা, তারপর একটু গম্ভীর গলায় বলেন, 'স্যরি, রান্না নিয়ে আমি একটু ব্যস্ত আছি। একটু পর আমার ছেলে স্কুল থেকে আসবে, খেতে দিতে হবে ওকে।'

'স্যরি ম্যাডাম, মাত্র দশ সেকেণ্ড সময়— ।'

মিথিলা আবার থামিয়ে দেন মেয়েটাকে, 'স্যরি।' মেয়েটাকে আর কোনো সুযোগ না দিয়ে কেটে দেন মোবাইলটা।

বিছানায় মোবাইলটা আবার ছুঁড়ে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন মিথিলা। সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বেজে ওঠে আবার। বিরক্তি নিয়ে সেটা হাতে নিয়েই দেখেন টুনির বাবার নাম। টুনির বাবা ফোন করেছে। মিথিলা দ্রুত রিসিভ করলেন, 'হ্যালো... ।'

'হ্যালো, এটা কি মিথিলা ম্যাডামের নাম্বার?'

মিথিলা অবাক হলেন। মোবাইলে টুনির বাবার নাম উঠলেও ওপাশে যে লোকটা কথা বলছেন, টুনির বাবা নন তিনি। কিছুটা শঙ্কিত গলায় বললেন, 'জি, মিথিলা বলছি।'

'আপনার সঙ্গে যে ফোনটা থেকে কথা বলছি আমি, সেটা কার ফোন?' ওপাশের লোকটি বললেন।

'আমার হাজবেন্ডের। কিন্তু আপনি— ।'

মিথিলাকে থামিয়ে দিয়ে লোকটি বললেন, 'আমি সাদাত। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগে আপনার হাজবেন্ড আপনাকে ফোন করেছিলেন। কল লিস্টে লাস্ট কলে আপনার নামটা দেখে তাই ফোন করলাম। আপনাকে একটু দ্রুত গুলশান এক নাম্বার থানায় আসতে হবে।'

'কেন?' চমকে উঠলেন মিথিলা।

'ফোনে তো সেটা বলা যাবে না। বলা ঠিকও হবে না। আপনি দ্রুত থানায় চলে আসুন। তারপর সবকিছু জানতে পারবেন। আপনি না আসা পর্যন্ত থানায় অপেক্ষা করব আমি আপনার জন্য।'

'বাবা, আজ কিন্তু বইটা আমাকে কিনেই দিতে হবে!' মিমনি বাবার হাত ধরে আবদারের সুরে বলল কথাটা। সাদাত তার একমাত্র মেয়ের আবদার রাখেননি, এমনটা হয়নি কখনো। মেয়ের একটা হাত ধরে তিনি বললেন, 'অবশ্যই দিব মা। তার আগে বাজারটা সেরে নিই।'

'ঠিক আছে, বাবা।' ঘাড় যতটুকু সম্ভব বাঁকিয়ে জবাব দিলো মিমনি।

সাদাত দাঁড়িয়ে আছেন একটা শপিং মলের সামনে। মিমনিকে নিয়ে তিনি এসেছেন বাজার করতে। মিমনি এবার এগারতে পড়বে। এ বয়সেই অংকের প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহ। অংকের কোনো বই পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায় সে একেবারে।

একটা বে-সরকারী ব্যাংকের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে চাকরি করেন সাদাত। তার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন অফিসে গিয়ে ক্রেডিট কার্ডের উপকারিতা সম্পর্কে কথা বলা এবং তা বিক্রি করা। খুব একটা ভালো কাজ না হলেও এতে বেশ ভালোভাবেই চলে যায় তার। অফিস থেকে খুব একটা বেতন পান না। প্রতি মাসে যে পরিমাণ কার্ড বিক্রি করতে পারেন, মাস শেষে তার একটা পার্সেন্টিজ পান তিনি। এটাই তার আসল রোজগার।

সাদাতের নিজেরও একটা কার্ড আছে। শপিং মল ছাড়া ক্রেডিট কার্ড চলে না বলে নিয়মিত বাজার সদাই শপিং মল থেকেই করেন তিনি। তবে এসব বড় বড় দোকানে আসার আরো একটা কারণ আছে তার। এখানকার বিক্রেতারা স্যার বলে সম্বোধন করেন কাস্টমারদের। স্যার শব্দটা শুনতে খুব ভালো লাগে সাদাতের।

মেয়েকে নিয়ে শপিং মলে ঢুকলেন সাদাত। ঝকঝকে চকচকে একটা দোকান। কোথাও এক টুকরো ময়লা পড়ে নেই। কেউ যদি ময়লা ফেলেনও

সাথে সাথে ক্লিনাররা সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছেন। দোকানটাতে কোনো কিছুর অভাব নেই। নানা ধরনের জিনিস থরে থরে সাজানো। দুধ, মিষ্টি, ফল, সবজি, চাল থেকে শুরু করে ডিম, লবণ, সেফটিপিন সবই আছে। প্রত্যেকটা তাকের সামনে একজন দু'জন করে বিক্রেতা দাঁড়িয়ে আছেন। সবার পরনে একই ড্রেস। তাদের দেখতে অনেকটা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর মতো লাগছে। কলেজে সবার চেহারা সুন্দর না হলেও এখানে সবার চেহারাই সুন্দর।

মিমনির হাত ধরে আলু রাখার জায়গায় এলে সাদাত। একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আলু কত করে?'

'স্যার, আলু ২২ টাকা কেজি। তবে পাঁচ কেজি নিলে আলুর সঙ্গে এক প্যাকেট ইঁদুর মারার বিষ পাবেন। একদম ফ্রি, স্যার।'

কথার শুরু এবং শেষে দু দুটো স্যার শব্দ শুনে মনটা ভালো হয়ে গেল সাদাতের। এরকম একটা মেয়ে তাকে স্যার ডাকছে! বড় ভালো লাগছে। স্যার ডাক শোনার আরেকবার ইচ্ছে হলো তার। আগের কথাটা ঠিক বুঝতে পারেননি, অনেকটা এমন ভাব করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনার কথা!'

'আমাদের এখানে আলু ২২ টাকা করে রাখা হয়, স্যার। আলুর সঙ্গে আমরা একটা প্রমোশনাল অফার রেখেছি।' মেয়েটা একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'দশ কেজি আলু এক সাথে কিনলে র‍্যাটম কোম্পানীর পক্ষ থেকে আপনি পাবেন এক প্যাকেট ইঁদুর মারার বিষ! সম্পূর্ণ ফ্রি!'

'চমৎকার তো!'

'দশ কেজি আলু কি প্যাকেট করে দিব, স্যার?'

'আমার আসলে দশ কেজি আলু লাগবে না। আমি যদি পাঁচ কেজি আলু নেই, তাহলে কি আমাকে আলুর সাথে হাফ প্যাকেট ইঁদুরের বিষ দেয়া হবে?' আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাদাত।

হেসে ফেললেন মেয়েটি, 'আমি এটা বলতে পারব না, স্যার। আপনি বরং আমাদের ম্যানেজারের সাথে একটু কথা বলুন। সম্ভবত তিনি এটার জবাব দিতে পারবেন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমার বাড়িতে ইঁদুর এমনিতেই নেই। আপনি বরং আমাকে পাঁচ কেজি আলুই দিন। ইঁদুরের বিষ লাগবে না।'

বিশ মিনিটের মধ্যে বাজার শেষ করলেন সাদাত। শপিং মল থেকে বের হচ্ছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মিমনি অভিমানী গলায় বলল, 'বাবা, তুমি কিন্তু একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছো।'

মেয়ের কথা শুনে বেশ লজ্জা পেলেন সাদাত। শপিং মলের এক কোনায় বই সাজানো আছে, হরেকরকমের বই। একটা না, দু দুটো বই কিনে দিলেন তিনি মেয়েকে।

শপিংমলের বাইরে এসেই চমকে উঠলেন সাদাত। রাস্তার ওপাশে অনেকগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। উদ্বিগ্ন হয়ে কী যেন দেখছে সবাই।

মেয়ের হাত ধরে সাবধানে রাস্তা পার হলেন তিনি। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি সেদিকে। ভীড় ঠেলে একটু সামনে এগুতেই দেখতে পেলেন কালো প্যান্ট আর আকাশী রঙের শার্ট পরা একটা লোক রাস্তায় পড়ে আছে, উল্টো হয়ে। মাথার পাশে জমাট রক্ত।

সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না লোকটার কাছে। ছাত্র বয়সে সাদাত রোভার স্কাউট করতেন। মানুষের বিপদে সাহায্য করা শিখেছেন তিনি সেখানেই। মানুষকে সাহায্য করার মাঝে আনন্দও আছে প্রচুর।

লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন সাদাত। হাঁটু মুড়ে পাশে বসলেন তার। একটা হাত নিজের হাতে তুলে পালস বোঝার চেষ্টা করলেন। না, কোনো পালস নেই। গলার কাছে হাত রাখলেন, সেখানেও কিছু টের পাওয়া যাচ্ছে না। ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন তিনি।

পরিস্থিতি বোঝার জন্য আশপাশে তাকালেন। কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে অনেকেই চলে গেছে। কাজ ফেলে এভাবে তাকিয়ে থাকার সময় আছে কার এই শহরে!

মিমনির কোনো আগ্রহ নেই রাস্তায় পড়ে থাকা লোকটির প্রতি। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বই দুটো পড়ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, বই পড়া ছাড়া জগতে আর কোনো কাজ নেই। সাদাত গলা নিচু করে বললেন, 'মিমনি, আমি এখন এই মানুষটাক হাসপাতালে নিয়ে যাব। তুমি কি এখন বই পড়া বাদ দিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করবে?'

বইয়ের দিক থেকে মুখ না সরিয়ে মিমনি বলল, 'বলো।'

'একটা সিএনজি ডাকতে পারবে তুমি?'

আগের মতোই বইয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'সিএনজি কি আমার কথা শুনবে, বাবা?'

'শুনবে।'

'তোমাদের কথাই শোনে না, আমি তো ছোট মানুষ!' বইয়ের দিকে এখনো তাকিয়ে আছে মিমনি।

দাঁড়িয়ে থাকা একটা মানুষ সাদাতের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

সাত—আট মিনিট পর একটা সিএনজি কাছে এসে দাঁড়াতেই লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরলেন সাদাত। শরীর বাঁকা করে, কৌশলে, নিজে প্রথমে উঠে মিমনিকে উঠতে বললেন তারপর সিএনজিতে। বই পড়তে পড়তেই সিএনজিতে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে সিএনজির ড্রাইভারকে সাদাত বললেন, 'দ্রুত, কাছের একটা হাসপাতালে চলুন।'

ষোল—সতের মিনিট পর একটা হাসপাতালের সামনে সিএনজিটা থামতেই দু হাতের ওপর লোকটাকে নিয়ে দ্রুত নেমে পড়লেন সাদাত, মিমনিকেও নামতে বললেন। সামনের পকেট থেকে ভাড়া নিতে বললেন তিনি ড্রাইভারকে। মিটারে যা উঠেছে ড্রাইভার তাই নিলেন, এক টাকাও বেশী নিলেন না। ব্যাপারটা ভালো লাগল তার।

হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়ার দশ—বারো মিনিট পর ডাক্তার এলেন। লোকটাকে বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর হতাশ স্বরে বললেন, 'স্যরি, মারা গেছেন ইনি।'

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল সাদাতের। রাস্তায় পড়ে ছিল মানুষটি। কী করবে সে এখন? মাথা কাজ করছে না আপাতত। কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগছে সব। একা মনে হচ্ছে নিজেকে। পাশ ফিরে দেখেন, কাঠের একটা টুলের ওপর বসে বই পড়ছে মিমনি।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে লোকটার প্যান্টের পকেটে হাত দিলেন সাদাত। যদি কোনো কাগজ-টাগজ কিংবা অন্যকিছু পাওয়া যায়! কোনো ঠিকানা পাওয়া যায় কোনো পকেটে। না, পেছনের এক পকেট, সামনের দু পকেটের একটাতেও কিছু নেই। হতাশায় ছেয়ে গেল সাদাতের চেহারা।

হঠাৎ কোমরের দিকেই চোখ যেতেই কিছুটা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সাদাত। উঁচু উঁচু লাগছে জায়গাটা। কিছুটা শংকিত হয়ে সেখানে হাত দিয়ে দেখেন-একটা মোবাইল। দ্রুত ভেতরের পকেট থেকে সেটা বের করেই চমকে ওঠেন তিনি, বেশ দামী একটা মোবাইল। সাদাত অবাক হয়ে যান, কেবল একটা মোবাইল নিয়েই বের হয়েছেন লোকটি! না একটা মানিব্যাগও ছিল, রাস্তায় পড়ে থাকার সময় কেউ দ্রুত সরিয়ে ফেলেছে সেটা? কোমরের কাছে পকেটে মোবাইলটা ছিল বলে কেউ টের পায়নি, নিতে পারেনি তাই।

মোবাইলটা নিজের পকেটে রাখলেন সাদাত। পরে এটার সাহায্যেই হয়তো লোকটার ঠিকানা বের করা যাবে। তার আগে লোকটাকে থানায় নেওয়া দরকার। কাছেই গুলশান এক নম্বর থানা। লোকটাকে দ্রুত সেখানে নিয়ে গেলেন তিনি, একাই। থানার বারান্দায় এসে মিমনি বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাবা, তুমি এসব কী ঝামেলা করছ বলো তো! দু দিন পর গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করব আমি, বই দুটো কিনে দিলে, বাসায় গিয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ব। তা না, কার না কার লাশ নিয়ে তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছো! তাছাড়া আম্মু বসে আছে তোমার জন্য। বাজার নিয়ে যাবে, তারপর রান্না হবে।' মিমনি বাবার হাত, তারপর আশপাশ তাকিয়ে বলল, 'বাজারের প্যাকেট কোথায় তোমার, বাবা!'

সাদাত নিস্পৃহভাবে বললেন, 'সম্ভবত সিএনজি কিংবা হাসপাতালে ফেলে এসেছি। এত ঝামেলার মধ্যে মাথায়ই ছিল না!'

থানার সাব ইন্সপেক্টর কুরবান আলী সাদাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাসপাতালে লাশটা কে এনেছে, আপনি?'

'জি।'

'তা, ভিকটিম আপনার কি হয়, রিলেটিভ?'

'না। ভদ্রলোককে আমি চিনি না।'

'তাহলে?'

'রাস্তায় পড়েছিল, নিতান্তই মানবতার খাতিরে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাঁচানো গেল না। তারপর থানায় নিয়ে এসেছি।'

'লাশের সঙ্গে কিছু পেয়েছেন?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন কুরবান আলী।

নিজের পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে সাদাত বললেন, 'এই মোবাইলটা পেয়েছি।'

'শুধু মোবাইল!'

'জি।'

'লাশের পকেট তো একদম খালি। পকেটের ক্যাশ ক্যাপিটাল কই, আপনার কাছে নাকি?' কোরবান আলী সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকালেন সাদাতের দিকে।

সাদাত কিছুটা বিব্রত হয়ে বললেন, 'না তো, আমি ওনার কাছে কোনো কিছুই পাইনি। কোমরের কাছে ভেতরের পকেটে কেবল এই মোবাইলটা ছিল, এটা পেয়েছি। আর কিছু আমার চোখে পড়েনি।'

কঠিন চোখে তাকালেন কোরবান আলী, 'এরকম একটা ভদ্রলোক খালি পকেটে বাসা থেকে বের হয়েছে, আমাকে সে কথা বিশ্বাস করতে বলেন আপনি! মফিজ পাইছেন আমাকে? ওসব ছেলে ভুলানো কথায় কাজ হবে না। টাকা পয়সা কত ছিল বের করুন।'

ভড়কে গেলেন সাদাত। সঙ্গে সঙ্গে সাব ইন্সপেক্টর কুরবান আলী বললেন, 'বারান্দায় যে ছোট মেয়েটা বসে বই পড়ছে, সেটা তো আপনার নিজেরই মেয়ে, নাকি?'

সাদাত ঢোক গেলার মতো করে বললেন, 'জি।'

'যান, বারান্দায় গিয়ে মেয়ের কাছে বসুন, ভাবুন। আমি আছি।'

লোকটার নিথর শরীরটা পড়ে আছে থানার বারান্দায়। পাশে কাঠের বেঞ্চটাতে চুপচাপ বসে আছেন সাদাত। হাতে লোকটর মোবাইল। একটু ফাঁকে আরেকটা বেঞ্চে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে মিমনি। দুদিন পর গণিত অলিম্পিয়াড, ভালো কিছু করতে হবে তাকে, ভালো করে পড়তে হবে তার জন্য।

উপকার করতে এসে সত্যিই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন, এটা কখনো ভাবেননি সাদাত। মোবাইলটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ তার খেয়াল হলো, লোকটার বাড়িতে কোনো খবরই দেয়া হয়নি এখনো!

মোবাইলের কল রেজিস্টার অপশনে গেলেন সাদাত। ডায়ালড নাম্বারসে গেলেন তারপর। সকাল নয়টা সাতাশে লাস্ট কল করেছেন ভদ্রলোক। কলটা গেছে মিথিলা নামে সেভ করা এক নাম্বারে। এখন বাজে সাড়ে দশটা। নাম্বারটাতে আবার চাপ দিলেন সাদাত।

ঘড়ির দিকে তাকালেন সাদাত। মিথিলার সঙ্গে কথা বলার পর সতের মিনিট কেটে গেছে। অপেক্ষা করছেন তিনি তার জন্য। চুপচাপ। মোবাইলটা এখনো হাতেই ধরা আছে তার।

বাসার মুন্সী সাহেব বেশ ভালো মানুষ, কিন্তু খারাপ একটা স্বভাব আছে তার- খুব অল্পতেই রেগে যান তিনি। অফিসের স্টাফরা সেটা জানেন এবং সব সময় চেষ্টা করেন তাকে না রাগাতে। কিন্তু কখনই তারা তা পারেন না। সকালে অফিসের ঢোকার আগেই একটা রাগের ঘটনা ঘটল। গাড়ি থেকে নেমে তিনি মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কী একটা চিন্তা কুটকুট করছিল মাথার ভেতর। মূল গেটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে খটাস করে লাথি মেরে, কপালে হাত ঠেকিয়ে, সালাম দিল দারোয়ান। চমকে উঠলেন তিনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে দারোয়ানের সামনে গিয়ে বললেন, 'তুমি কি আমাকে সালাম দিয়েছ?'

দারোয়ান কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলল, 'জি, স্যার।'

'সালামটা আবার দাও তো দেখি।'

মাটিতে আবার লাথি দিয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে, দারোয়ান বলল, 'ছালামালাইকুম, ছার।'

কপাল কুঁচকে দারোয়ানের দিকে তাকালেন বাসার মুন্সী। গলাটা আগের চেয়ে গম্ভীর করে বললেন, 'সালাম দেওয়ার সঙ্গে মাটিতে লাথি দেওয়ার সম্পর্ক কী?'

'আমি জানি না, ছার।'

'তাহলে দাও কেন?'

'সুপারভাইজার ছার দিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, সালাম দেওয়ার সময় বেশি করে মাটির সঙ্গে পা দিয়ে আওয়াজ করতে।'

'আর কিছু বলেননি সুপারভাইজার সাহেব?'

'জি বলেছেন।' দারোয়ার বুক উঁচু করে বলল, 'সালাম দেওয়ার সময় সিনা টান করে রাখতে বলেছেন।'

'কপালেও হাত ঠেকাতে বলেছেন, না?'

'জি।' দারোয়ান আপনা আপনি ডান হাতের আঙুলগুলো সোজা করে বলল, 'হাতের আঙুলগুলো তীরের মতো সোজা রাখতে বলেছেন।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বাসার মুন্সীর। নিজের রুমে ঢুকে কলিংবেল টিপলেন। ফাহিম এসে সামনে দাঁড়াতেই চিৎকার করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজেকে দ্রুততার সঙ্গে কন্ট্রোলে এনে থেমে গেলেন। এই ছেলেটাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন তিনি। বারো বছর, তার ছেলের বয়সী, কিন্ত এতিম। দেশের বিভিন্ন এতিমখানা থেকে প্রতি বছর একটা করে ছেলেকে তিনি তার প্রতিষ্ঠানে কাজ দেন। হাতে-কলমে তারা কাজ শেখে, আবার লেখাপড়াও করে। এ পর্যন্ত নয়জনকে এভাবে গড়ে তুলেছেন তিনি। এ অফিসের সহকারী হিসাবরক্ষক, প্রধান নিরাপত্তা কর্মী, অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার তো ওই এতিমখানা থেকেই আনা। সেই দশ-বারো বছর বয়সে এনেছিলেন, এখন সবাই এই অফিসের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে।

ফাহিমকে খুব বেশী পছন্দ করার কারণ হচ্ছে, ছেলেটা অসম্ভব আনন্দ প্রিয় এবং ভয়াবহ হাসি খুশি। হাসি খুশি ছেলেদের কার না পছন্দ!

দরজার একটু সামনে দাঁড়িয়েছিল ফাহিম। হাত দিয়ে ইশারা করে কাছে ডেকে বাসার সাহেব বললেন, 'একটা কাজ করতে পারবে তুমি?'

'জি স্যার, পারব।'

'কী কাজ, তা না শুনেই বললে পারব!'

'জি স্যার, এই অফিসের সব কাজ করতে পারব আমি।'

'সব কাজ করতে পারবে! যদি বলি, লম্বা একটা মানুষকে থাপ্পড় মারতে হবে তোমার, পারবে?'

'পারব। কিছু না, তার জন্য আমরা একটা টুল লাগবে। টুল নিয়ে সেই লম্বা মানুষটার সামনে দাঁড়াব, টুলে উঠব, তারপর থাপ্পড় মারব।'

মনে মনে হেসে ফেললেন বাসার সাহেব। ফাহিমের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'যদি বলি কারো মাথার চুল টেনে তুলতে হবে, পারবে?'

'পারব। তবে ওসব টানাটানির দরকার কী, সোজা তাকে নাপিতের কাছে নিয়ে যাব, নাপিত ক্ষুর দিয়ে চেছে সব চুল ফেলে দেবে তার।'

'দাঁত যদি তুলে ফেলতে বলি একটা?'

'সেটাও সম্ভব। তবে তার আগে লোকটাকে ভালো করে ব্রাশ করিয়ে নিতে হবে। না হলে তার মুখের গন্ধে আমি নিজেই অজ্ঞান হয়ে যাব।'

বাসার সাহেব বেশ কিছুক্ষণ ফাহিমের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'থ্যাংকস, ভেরি ভেরি থ্যাংকস।'

'ওয়েলকাম, স্যার।' ফাহিম একটু চিন্তাযুক্ত হয়ে বলল, 'কোন লোকটাকে এসব করতে হবে?'

বাসার সাহেব গলাটা গম্ভীর করে বললেন, 'তোমাকে বলব। তার আগে সুপারভাইজার সাহেবকে আসতে বলো এখানে।' মেজাজটা আরো বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার। খুব দ্রুত সেটা ঠাণ্ডা করতে হবে, না হলে বড় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে আজ।

মুন্সী গ্রুপ অব ইন্ড্রাস্ট্রির সুপারভাইজার হেকমত জোয়ার্দার সব সময় পান খান আর গুনগুন করে গান গান। দিনে তিনি কমপক্ষে দুই ডজন পান খান, সঙ্গে ছোট এক ডিব্বা চুনও। তার স্ত্রী বাসা থেকে একটা স্টিলের পানের বাক্সে পান বানিয়ে সাজিয়ে দেন যত্ন করে, চুনটা তিনি অফিসের সামনের দোকান থেকে কিনে আনেন পিওনকে দিয়ে। এই অফিসে পিওনদের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটা কাজ হচ্ছে, তিনি অফিসে আসার আগেই তার জন্য ছোট্ট ডিব্বাটা চুন দিয়ে বোঝাই করে রাখা। অফিসে এসেই চুনের দামটা তিনি অবশ্য পিওনকে দিয়ে দেন।

কিন্তু আজ অফিসে ঢুকেই হেকমত জোয়ার্দার দেখলেন, ডিব্বা খালি, গতকাল যেভাবে রেখে গিয়েছিলেন সেভাবেই পড়ে আছে। এটুকু কিছুটা ঠিক ছিল, কিন্ত পরবর্তী ব্যাপারটা দেখে বুকের ভেতর আগুন জ্বলে গেলে তার— ডিব্বার উপরের দিকে, মুখের কাছে, কালো এক টুকরা ইয়ে করে রেখেছে একটা বজ্জাত টিকটিকি।

ডিব্বার পাশে রাখা কলিংবেলটায় দ্রুত চাপ দিলেন তিনি। কোনো পিওন এলো না। আবার চাপ দিলেন, এবারও এলো না। রাগে তিনি চেয়ার থেকে যখন উঠতে যাবেন, ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকল ফাহিম। হেকমত সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ডাকাতের মতো এভাবে শব্দ করে রুমে ঢুকবে না তো!'

ফাহিম মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'তাহলে কি চোরের মতো পা টিপে টিপে ঢুকব?'

হেকমত জোয়ার্দার ঠেস দিয়ে বসলেন চেয়ারে। এভাবে বসার কারণ হচ্ছে, ইচ্ছেমতো বকবেন তিনি এখন ফাহিমকে। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, মেজাজটা ঠাণ্ডা করা দরকার। টেবিলের পাশে ডিব্বাটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমার চুনের ডিব্বা খালি কেন?'

'তা তো জানি না।' উত্তর দিল ফাহিম।

'এটা জানো না তো জানোটা কী?'

'এটাও জানি না।'

চেহারা কিছুটা বিকৃত করে হেকমত সাহেব বললেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ উত্তর কি, এটা জানো তো?'

'জি, জানি—জানি না।'

ঠেস থেকে সোজা হয়ে বসলেন হেকমত সাহেব। ডান হাতের আঙুল মুখের এক কোনায় ঢুকিয়ে, চাবানো কিছু পান বের করে, সেগুলো আবার মুখের ভেতর চালান করে দিয়ে বললেন, 'পিপিলিকার পাখা গজায় কেন?'

'প্লেনের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেওয়ার জন্য।'

'তাই!' কিছুটা চিবিয়ে বলার মতো করে হেকমত সাহেব বললেন, 'মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জানো, কুকুরের মতো কারো পাছায়— ।' হেকমত সাহেব একটু থেমে বলেন, 'যাক গে, কুকুর আমাদের কামড় দিলেও আমরা তো আর কুকরকে কামড় দিতে পারি না, কারণ— ।'

হেকমত সাহেবের কথাটা কেড়ে নিয়ে ফাহিম বলল, 'এতে দ্বিতীয়বার কামড় খাওয়ার ভয় থাকে।'

চেহারাটা আবার বিকৃতি করেন হেকমত সাহেব, 'তুমি একটা গাধা!'

'গাধার ভাষা কেবল গাধারাই বুঝতে পারে, কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না। আপনি কিন্তু আমার কথা বুঝতে পারছেন!'

'শোনো ফাহিম, বড় সাহেব তোমাকে ভালোবাসে বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলে যাবে, এটা ঠিক না।' ডান হাতের কবজিটা মোচড়াতে মোচড়াতে তিনি বললেন, 'পৃথিবীতে সব কিছুই সম্ভব, অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

'আছে। জেব্রার কখনো রঙিন ছবি তোলা সম্ভব না।'

হেকমত সাহেব কিছুটা থেমে থেকে বলেন, 'নিজেকে খুব চালাক ভাবো, না? এটা ভালো জিনিস না।' চুনের ডিব্বাটা ফাহিমকে দেখিয়ে বললেন,

'এটাতে চুন তো ভরেই রাখা হয়নি, এটার ওপর একটা টিকটিকি তার ইচ্ছেমতো কাজ সেরে গেছে, বলি এটা কেন?'

'টিকটিকিটার সম্ভবত খুব বেশী বাথরুম চেপেছিল, বাথরুমে যাওয়ার সময় পায় নাই।'

চোখ দুটো বুজে ফেললেন হেকমত সাহেব, 'ফাহিম তুমি এ অফিসে যা করো, তার জন্য তেমন যোগ্যতা লাগে না! মানুষ তা ঘুমের মাঝেও করতে পারে।' চোখ দুটো খুলে ফাহিমের দিকে ভালো করে তিনি তাকান, 'মানুষ কোন কাজটা ঘুমের মধ্যেও করতে পারে, তা জানো তো?' ।

'জি। বিছানায় শুয়ে থাকার কাজটা।'

রাগে মাথাটা চেপে আসছে হেকমত সাহেবের। কপালে দু আঙুল দিয়ে চাপ দিতে দিতে তিনি বললেন, 'আমার সামনে থেকে এখন দূর হও।'

'মন খারাপ করিয়ে দিলাম, স্যার!' ফাহিম একটু হেসে বলল, 'মন খারাপ করবেন না। যদি আপনার মন কখনো খারাপই হয়, তখন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন আর বলবেন-আহ্, আমি কত সুন্দর, আমি কত ভালো, আমি কত সুখী। মনটা ভালো হয়ে যাবে আপনার। তবে প্রতিদিনই এটা করতে যাবেন না, কারণ মিথ্যা বলা মহা পাপ। ভালো কথা-।' ফাহিম আগের মতোই হাসতে হাসতে বলল, 'বড় স্যার আপনাকে ডেকেছেন।'

'কখন ডেকেছেন?'

'এই তো, আমি তো আপনাকে সেটা বলার জন্যই হন্তদন্ত হয়ে আপনার রুমে এসেছিলাম।'

'সেটা এতক্ষণ পর বললে! আগে বলোনি কেন!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান হেকমত জোয়ার্দার।

'আপনি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন, উত্তর দিচ্ছিলাম আমি সেগুলোর। উত্তর না দিলে তো বলতেন—বেয়াদব ছেলে!'

মেজাজ তো ঠাণ্ডা হলোই না হেকমত জোয়ার্দারের, আরো আগুন হয়ে গেল সমস্ত মাথাটা। ইচ্ছে করছে, টেবিলের ওপর রাখা কাচের ভারী পেপারওয়েটটা দিয়ে নিজের মাথায় একটা আঘাত করতে।

বাসার মুন্সী বার বার ফোন করছেন বাসায়, ফোন বাজছে, কিন্তু কেউ ধরছে না। টিএন্ডটিতে করছেন, বাজছে, কেই ধরছে না; বাসায় একটা মোবাইল

আছে, সেটাতেও করছেন, বাজছে, রিসিভ হচ্ছে না এটাও। মুন্সী গ্রুপের চেয়ারম্যান তিনি, তার স্ত্রী নাজমা আয়েশা হচ্ছেন ডিরেক্টর। তারা দুজন এখন অফিসে। কিন্তু বাসায় তার একমাত্র ছেলে আছে, বৃদ্ধ মা আছে, একটা কাজের ছেলেও আছে, ফোন ধরছে না কেউই! মাথা আরো গরম হয়ে গেল তার, একটু পর দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করবে।

মাঝে মাঝেই এরকম হয়—ফোন বাজে কেউ ধরে না। একবার এরকম হয়েছিল। ফোন করেন, কেউ ধরে না। টেনশনে এসি রুমের ভেতর বসেও ঘামছিলেন তিনি। প্রায় এক ঘণ্টা পর বাসায় গিয়ে দেখেন, সবাই টিভি রুমে বসে প্রায় ফুল স্পিডে টিভি চালিয়ে মজার একটা ছবি দেখছে, আর হো হো করে হাসছে।

আজ এরকম কিছু হলো না তো! ব্যাপারটা তার স্ত্রীকে জানানো দরকার। কিন্তু তিনি জানতে পেরেছেন, অফিসের একটা কাজ নিয়ে মিটিংয়ে বসেছে সে। বিরক্ত করতে চাচ্ছেন না তাই তাকে।

টেলিফোন করেই যাচ্ছেন বাসার সাহেব। এরই মধ্যে সুপারভাইজার হেকমত জোয়ার্দার রুমে ঢুকলেন তার। তার দিকে গভীরভাবে তাকালেন বাসার সাহেব, 'আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে নাকি?'

'না তো, স্যার!'

'তাহলে এতক্ষণ বাথরুমে বসেছিলেন কেন আপনি?'

'না স্যার, আমি তো বাথরুমে ছিলাম না।'

বাসার সাহেব একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'মিথ্যা কথা বলবেন না হেকমত সাহেব। মিথ্যা কথা আমি একদম পছন্দ করি না। আপনি ঘনঘন পান খাবেন, আবার ঘনঘন মিথ্যা কথা বলবেন, সেটা তো হতে পারে না! যারা পান খান, তাদের মুখটা লাল হয়ে যায়, কিছুটা সুন্দর দেখায়। ওরকম সুন্দর মুখে মিথ্যা কথা একেবারেই মানায় না।'

'স্যার, আমি সত্যি বলছি, বাথরুমে ছিলাম না আমি।'

চোখ দুটো সরু করে বাসার সাহেব এবার হেকমত জোয়ার্দারের দিকে তাকালেন, 'বাথরুমে ছিলেন না তো কোথায় ছিলেন?'

'আমার রুমেই ছিলাম।'

'আপনার রুমে থাকলে এত দেরি করলেন কেন? আপনাকে তো আমি অনেক আগে ডেকেছি। ফাহিম গিয়ে আপনাকে খবরও দিয়েছে।'

মাথা নিচু করে ফেললেন হেকমত জোয়ার্দার। বাসার সাহেব মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি এবার একটা সালাম দিন তো।'

মাথা উঁচু করে ফ্যাল ফ্যাল চোখে হেকমত জোয়ার্দার তাকালেন। বাসার সাহেব বললেন, 'জি, আপনাকে একটা সালাম দিতে বলেছি। আপনি আমাকে একটা সালাম দিন।'

ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হেকমত সাহেব ডান হাতটা উঁচু করে বললেন, 'স্যার, আসসালামু ওলাইকুম।'

চোখ দুটো বড় বড় করে ফেললেন বাসার মুন্সী। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'আপনি তো ঠিকভাবেই সালাম দিলেন। কিন্তু অফিসের দারোয়ানকে ওভাবে সালাম দিতে বলেছেন কেন?'

হেকমত জোয়ার্দার অবাক স্বরে বললেন, 'কীভাবে দিতে বলেছি, স্যার?'

'কীভাবে দিতে বলেছেন, সেটা তো আপনি জানেন-সালাম দেওয়ার সময় মাটির সঙ্গে ওরকম খটাস করে শব্দ করার কি দরকার?'

হেসে ফেলেন হেকমত জোয়ার্দার। দু হাত কচলানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'ও আচ্ছা, ওটা একটা স্টাইল আর কি!'

'ওভাবে তো সালাম দেয় পুলিশ। ছোট র‍্যাংকের পুলিশরা বড় র‍্যাংকের পুলিশদের দেয়—বুট জুতো মাটির সঙ্গে লাগিয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে, সটান হয়ে দাঁড়িয়ে দেয়। আপনি কি আমাকে পুলিশ ভেবেছেন?' বাসার সাহেব একটু থেমে বলেন, 'শোনেন হেকমত সাহেব, লেখাপড়া শেষ করার পর পুলিশে যোগ দিতে চেয়েছিলাম, সরাসরি সাব—ইন্সপেক্টরে। সেটা শুনে আমার বাবা মুন্সী জহিদুল ইসলাম সাহেব কী বলেছিলেন জানেন?' বাসার সাহেব আবার একটু থামেন, 'বলেছিলেন, বাবা বাসার, যদি তুমি পুলিশে ভর্তি হও, তাহলে সারাজীবনের জন্য আমার বাসার দরজা তোমার জন্য বন্ধ। কেন বলেছিলেন, এটা জানেন? পুলিশে চাকরি করলেই ইচ্ছে—অনিচ্ছায় ঘুষ খেতে হবে। মুন্সী জাহিদুল ইসলাম সাহেবের ছেলে ঘুষ খাবে, ঘুষের চাকরি করবে, এটা তিনি দুঃস্বপ্নেও দেখতে চাননি।'

'সরি স্যার।'

'যান, দারোয়ানের সালামের স্টাইলটা বদলে ফেলুন। ওরকম পুলিশী স্টাইলের কোনো প্রয়োজন নেই।'

হেকমত জোয়ার্দার বের হতে যাচ্ছিলেন রুম থেকে। তার আগেই বাসার সাহেব বললেন, 'হেকমত সাহেব, আমার বাবা খুব রাগী মানুষ ছিলেন। সৎ মানুষরা একুট রাগীই হন, আশপাশে অনেক অন্যায় দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেন না। বাবার সাথে কথা বলতে আমরা সব ভাই-বোন খুব ভয় পেতাম, আমার মা—ও ভয় পেতেন। আমাদের যা কিছু আবদার থাকত, ওই সকালে বেলা বাবা যখন অফিসে যেতেন, তার আগে। কারণ বাবা তখন দিনের প্রথম পানটা খেতেন। পানটা মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম হয়ে যেতেন বাবা। সারা মুখ, চেহারা, চোখ হাসতে থাকত তার। গলার স্বরও কেমন পাল্টে যেত।' চোখ দুটো ছলছল করে বাসার সাহেব বললেন, 'যান তো, আপনার ওখান থেকে একটা পান নিয়ে আসুন, প্লিজ। অনেকদিন পর একটা পান খাই, দেখি মেজাজটা ঠাণ্ডা করতে পারি কিনা।'

হেকমত সাহেব রুম থেকে বের হতেই চা নিয়ে ঢুকল একটা পিওন। দ্রুত কাপে চুমক দিয়েই মেজাজটা দ্বিতীয়বারের মতো খারাপ হয়ে গেল বাসার সাহেবের। চায়ে চিনি দেয়নি বললেই চলে। পিওনকে ধমক দিয়ে তিনি বললেন, 'চা কে বানিয়েছে?'

ভয় ভয় গলায় পিওন বলল, 'আমি স্যার।'

'এ অফিসে চা বানানোর জন্য যে চিনি কেনা হয়, তা কি তোমার টাকা দিয়ে কেনা হয়?'

'না, স্যার।'

'তাহলে চায়ে চিনি এতো কম দিয়েছ কেন?' বলেই চাসহ কাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেঝেতে। প্রচণ্ড শব্দ পেয়ে মিটিং থেকে দ্রুত উঠে এসে বাসার সাহেবের রুমে ঢুকলেন নাজমা আয়েশা। স্বামীর চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'কী হয়েছে তোমার?'

প্রচণ্ড রেগে আছেন বাসার সাহেব। কিন্তু তিন শান্ত গলায় বললেন, 'চায়ে চিনিই দেয় নাই। চিনি ছাড়া চা খাওয়া আর পানি খাওয়া তো একই কথা।'

স্বামীর কাছে গিয়ে পিঠে একটা হাত রাখলেন নাজমা আয়েশা, শান্ত গলায় বললেন, 'যাদের রক্তে সুগার আছে, তাদের তো চিনি খেতে হয় না বাসার। তুমি সারাক্ষণ টেনশনে থাকো, সারাক্ষণই তোমার সুগার বাড়তে থাকে। এরই মধ্যে তুমি যদি চায়ে চিনি খাও, তাহলে ব্যাপারটা জটিলতার দিকে যাবে না! আমি নিজেই তোমার চায়ে চিনি দিতে মানা করেছি।'

'ঠিক আছে, চা আর খাব না।' অভিমানী স্বরে বললেন বাসার সাহেব। তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমার সামনে তোমরাও চায়ে চিনি খেতে পারবে না। আমি সেটা হতে দেব না। আজ থেকে এই অফিসে চিনি দেওয়া চা বন্ধ। সবাই ডায়বেটিস চা খাবে।'

নাজমা আয়েশা মুচকি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি এখন শান্ত হও। তোমার জন্য আমি নিজে একআপ চা বানিয়ে আনছি।'

বাসার সাহেবের মোবাইলটা বেজে উঠল হঠাৎ। হাতে নিয়ে দেখেন, স্ক্রিনে প্রতিবেশী আজমল সাহেবের নাম। খুব সজ্জন মানুষ তিনি। কিন্তু তিনি তো তেমন ফোন করেন না। আজ যেহেতু করেছেন, নিশ্চয়ই জরুরী কোনো ব্যাপার আছে!

স্বামীর চেহারার পরিবর্তনটা ধরতে পারলেন নাজমা আয়েশা। কপাল ভাঁজ করে ফেললেন তিনিও। বাসার সাহেব দ্রুত ফোনটা রিসিভ করেই কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আজমল সাহেব বললেন, 'বাসার সাহেব, আপনাকে যে তাড়াতাড়ি বাসায় আসতে হবে। আপনার ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে আগুন লেগেছে।'

'বলেন কি? কখন থেকে?'

'ঠিক কখন থেকে বলতে পারব না। আপনার ভাবী কী একটা কাজে রান্না ঘরে গিয়েছিল, জানালা দিয়ে দেখে, ধোঁয়া বের হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট থেকে। দেখেই, দৌড়ে এসে আমাকে জানাল, আমি আবার আপনাকে জানালাম।'

চেয়ার থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন বাসার সাহেব। ভয়াবহ বিপদের কথা! বাসায় তার এক মাত্র ছেলে, মা আর কাজের ছেলেটা আছে। তাদের অবস্থা এখন কেমন, কে জানে!

'আমরা এখনই আসছি, আজমল সাহেব। আপনি একটু আমার ফ্ল্যাটের দিকে যান, প্লিজ। ওখানে আমার মা, ছেলে আর কাজের ছেলেটা আছে। ওদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করুন। প্রয়োজন হলে সামনের দরজা ভেঙে ফেলুন।' কথা শেষ করেই লাইন কেটে দিলেন বাসার সাহেব। তারপর অপারেটরকে বললেন, 'এক্ষুনি ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করে আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা দাও। যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে সেখানে যেতে বলো। হারি আপ।'

রাতুলদের ব্ল্যাক ক্যাবটা চিড়িয়াখানার গেটের সামনে এসে থামল। অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এখানে। কেউ চিড়িয়াখানায় ঢোকার জন্য টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়ানো, কেউ চিড়িয়াখানা ঘুরে এখন বাইরে বের হচ্ছে। সায়ন্ত দেরি না করে ক্যাব থেকে নেমে পড়লেন। রাতুলও নামল। মিটারে ২৮০ টাকা উঠেছে। সায়ন্ত একটু অবাকই হলেন, 'মিটার ঠিক আছে তো আপনার, ড্রাইভার সাহেব! এইটুকু রাস্তায় দুইশ আশি টাকা!!'

ড্রাইভার পান খাওয়া হলুদ দাঁতগুলো মুখের বাইরে এনে নরম গলায় বললেন, 'আইজই বিআরটি থনে মিটার চেকিং দেয়াই আনলাম। একশতে একশ ঠিক আছে। কোন দুই লম্বরি নাই।'

পাঁচশ টাকার একটা নোট বের করে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে রাতুলের দিকে তাকালেন সায়ন্ত। ছেলেটা এদিক সেদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে। মনে হচ্ছে, বাসা কোথায় সেটা চেনার চেষ্টা করছে সে। ড্রাইভার বাকী টাকা ফেরত দিতেই সায়ন্ত রাতুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবু, দেখো তো জায়গাটা তোমার চেনা মনে হয় কি না?'

আশপাশটা আরো ভালো করে দেখতে লাগল রাতুল। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে দেখার পর ডানে বামে মাথা ঝাঁকিয়ে না বোধক সংকেত দিল সে। তবে বিজ্ঞের মতো একটা কথা কিন্তু ঠিকই বলে ফেলল, 'আচ্ছা আংকেল, আমরা বরং সামনের ওই ফাস্ট ফুডের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি। দেখি, দোকানদার আমাকে চেনে কি না! যদি আমার বাসা এখানে হয়, তাহলে আমাকে চিনতেও পারেন তিনি।'

রাতুলের আইডিয়াটা পছন্দ হলো সায়ন্তর। আসলেই বুদ্ধিমান ছেলে! মনে মনে ভাবলো সায়ন্ত। তারপর ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'চলো তো দেখি, তোমাকে চিনতে পারেন কিনা দোকানদার!'

রাতুল আর সায়ন্ত বসে আছেন 'গরম গরম ফাস্টফুড'-এর দোকানে। এই দোকানের মালিক জুলহাস মণ্ডল সাহেব বিশেষ প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে বাইরে আছেন। তবে দোকানের কর্মচারী আজিজ কাউন্টারেই আছেন। মোটামুটি বেশ বড় দোকান। তবে সমস্যা হচ্ছে, দোকানে কোনো কাস্টমার নেই। খালি পড়ে আছে সবগুলো টেবিল।

সায়ন্ত আদ্যোপান্ত সব খুলে বললেন আজিজকে। সবশেষে প্রশ্ন বললন, 'দেখুন তো, এই ছেলেটাকে আপনি চেনেন কি না?'

রাতুলকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন আজিজ। সামনা—সামনি, পাশাপাশি, সব দিক থেকেই চেহারা চেনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনোভাবেই মেলাতে পারলেন না, 'না ভাই। এই ছেলেকে আমি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'আরো একটু ভালো করে দেখুন, প্লিজ।'

'ভালো করেই দেখেছি, ভাইজান। এ ছেলেকে আমি কখনো দেখিনি।'

পর্যবেক্ষণ চলাকালীন সময়ে এরই মধ্যে দুই টুকরো পেস্ট্রি কেক খেয়ে ফেলেছে রাতুল। বাসা না পাবার দুশ্চিন্তায় সেটা খেয়ালই করলেন না সায়ন্ত। খেয়াল হলো তখন, দোকানদার যখন পেস্ট্রি বাবদ বিলটা চাইলেন।

বিল দিয়ে সায়ন্ত হতাশ হয়ে বের হয়ে এলেন দোকান থেকে। নিজের জন্য না, কষ্ট লাগছে তার রাতুলের জন্য। বেচারা এত টুকুন ছেলে, মা বাবার কাছে যাবার জন্য ছটফট করছে. অথচ বাসা খুঁজে পাচ্ছে না।

রাতুল হঠাৎ সায়ন্তের একটা হাত ধরে বলল, 'আংকেল, দোকানদার আমাকে নাও চিনতে পারে। কারণ আমি বোধহয় ওই দোকানে কখনো যাইনি। তবে আমার বাসা যদি এখানে হয় তাহলে আমি চিড়িয়াখানায় নিশ্চয়ই ঢুকেছি। বানর, হাতি, বাঘ এদের খাঁচার সামনে গিয়েছি। সুতরাং এই জায়গার কেয়ারটেকারদেরা কেউ না কেউ আমাকে চিনবেই।'

'গ্রেট! এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছো! এই এলাকার ছেলে, আর সে কখনো চিড়িয়াখানায় যাবে না, তা তো হয় না। ঠিক আছে চলো, আমরা

চিড়িয়াখানায় ঢুকি। এবার তোমার বাসার ঠিকানা পাবোই পাবো।।' বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললেন সায়ন্ত।

চিড়িয়াখানায় ঢুকেই বানরের খাঁচার সামনে পড়লেন দুজনে। বানর দেখে রাতুলের উচ্ছলতা দেখে কে! বানরের মতো সেও লাফাতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর সায়ন্তের কাছে এসে সে বলল, 'আংকেল, আমাকে দশ টাকার বাদাম কিনে দাও না, বানরকে বাদাম খাওয়াব আমি।'

রাতুলের উচ্ছলতা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল সায়ন্তের। অসুস্থ ছেলে, বাবা মায়ের টেনশনে ছেলেটা মনমরা হয়েছিল এতক্ষণ। বানর দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছে সে। সায়ন্ত খুশি হলেন, 'এখানে বাদাম কোথায় পাবো?'

ডান দিকে ইশারা করে একটা দোকান দেখাল রাতুল, 'ওই যে আংকেল, ওদিকে। তুমি টাকা দাও আমি নিয়ে আসি।'

সায়ন্ত টাকা দিলেন। টাকা হাতে পেয়ে রাতুল পাখির মতো উড়তে উড়তে দৌড়ে গেল বাদামের দোকানের দিকে। ছেলেটার উচ্ছলতা দেখে নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে গেল তার। চিড়িয়াখানায় এলে সেও রাতুলের মতো খুশি হয়। খুশিতে কী করবে ভেবে পায় না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, মাঝে মাঝেই ছেলেকে নিয়ে এখানে আসবেন। সারাদিন কাটিয়ে আবার ফিরে যাবেন বাসায়।

বাদাম নিয়ে ফিরে এসেছে রাতুল। বানরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে বাতাম ছুড়ে দিচ্ছে খাঁচার ভেতর। সেই বাদাম দখলের জন্য বানরদের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে। তাই দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে সে। ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছে সায়ন্তের।

রাতুল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আংকেল, বানররা কি ওদের ছেলে-মেয়েদের কোনো নাম রাখে?'

'সম্ভবত রাখে।'

'কী নাম রাখে?'

'একেকজনের একেক নাম রাখে।'

'তা তো জানি, কিন্তু কী ধরনের নাম রাখে? মানুষের যেমন সাদিদ. তপু, মিতু, রিফাত, পাভেল নাম থাকে, ওদের কী ধরনের থাকে?' খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল রাতুল।

মুশকিলে পড়ে গেলেন সায়ন্ত। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। বানররা তাদের ছেলে মেয়েদের কী ধরনের নাম রাখতে পারে, সেরকম কোনো আইডিয়াই তো নেই তার মাথায়।

রাতুল আবার জিজ্ঞেস করতে যাবে, তার আগেই গায়ে খাকি পোশাক পরা একটা লোক এসে দাঁড়ালেন তার সামনে। হাতে একটা মোটা লাঠি তার। কিছুটা ধমকের সুরে বললেন, 'এই ছেলে, বানরকে খাবার দিচ্ছ কেন তুমি? জানো না, চিড়িয়াখানার পশুদের বাইরের খাবার দেয়া নিষেধ?'

রাতুল স্বাভাবিকভাবে বলল, 'বাইরের খাবার দেওয়া নিষেধ কেন?'

'বাইরের খাবার খেয়ে পশুরা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।'

'তা তো জানতাম না।' রাতুল হাতের বাদামগুলো পকেট ঢুকিয়ে বেশ অপরাধী গলায় বলল, 'সরি, আংকেল।'

ব্যাপারটা সায়ন্ত জানতেন, কিন্তু একটুও খেয়াল ছিল না তার। লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'স্যরি। সত্যি ভুল হয়ে গেছে! অসুস্থ ছেলে তো!' সায়ন্ত লোকটার দিকে ভালো করে তাকালেন, 'আপনি সম্ভবত এখানকার গার্ড।'

'জি।'

'একটা কথা বলি আপনাকে।' সায়ন্ত বেশ নরম গলায় রাতুলকে দেখিয়ে বললেন, 'এই যে বাচ্চাটাকে দেখছেন, সে তার বাসা হারিয়ে ফেলেছে। অসুস্থ ছেলে তো! দু তিন ঘণ্টা পর পর নাকি সে সবকিছু ভুলে যায়। তবে চিড়িয়াখানার আশে পাশে যে তার বাসা, এটা বলতে পেরেছে সে। ভালো করে একটু দেখুন তো, এর আগে ওকে কখনো দেখেছেন কিনা এখানে?'

দু গাল প্রশস্ত করে হাসি দিলেন গার্ড সাহেব, 'সারাদিন হাজার হাজার মানুষ আসে এখানে। কত রকম চেহারা, কত পদের পোশাক। একজনকে মনে রাখা তো খুব কঠিন, ভাইজান।'

'আরো একটু ভালো করে দেখুন না, প্লিজ।' রাতুলকে গার্ডের পাশে আনলেন সায়ন্ত। গার্ড সাহেব আরো একবার তার দিকে তাকিয়ে হতাশার স্বরে বললেন, 'নাহ্, একে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

শেষ চেষ্টা হিসেবে সায়ন্ত বললেন, 'ওর নাম রাতুল।'

'না, পুতুল নামে আমার এক বোনের মেয়ে আছে। রাতুল! এই প্রথম এই নামটা শুনলাম আমি।' মাথা এদিক—ওদিক করে চলে গেলেন গার্ড।

গার্ড চলে যেতেই রাতুলকে নিয়ে সামনের দিকে এগুলেন সায়ন্ত। একে একে জিরাফ, জেব্রা, সাপ, উটপাখি, বেজি, বাঘ, সিংহ, ভালুক, গণ্ডার, হরিণ দেখে হাজির হলেন হাতির খাঁচার সামনে। হাতি দেখে রাতুল কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। সায়ন্ত ব্যাপারটা লক্ষ করে রাতুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো সমস্যা, রাতুল?'

রাতুল যেন এই প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিল। সায়ন্তের কাছে এসে মিনমিনে স্বরে বলল, 'আংকেল, আমার কেমন যেন মনে পড়ছে আমি হাতির পিঠে চড়েছি। হাতি আমাকে নিয়ে ছোট্ট একটা মাঠের মধ্যে ঘুরছে। আমার বাবা মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে আর তালি দিচ্ছে। এই তো বাবার নামটা প্রায় মনে পড়ে যাচ্ছে, বা... বা..।'

রাতুলের স্মৃতি শক্তি ফিরে আসছে দেখে সায়ন্ত যার পর নাই খুশি হলেন। রাতুলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে করার চেষ্টা করো রাতুল। ব দিয়ে তোমার বাবার নাম। মনে করার চেষ্টা করো, প্লিজ, একটু ভালোভাবে চেষ্টা করো। তুমি পারবে। আমার বিশ্বাস তুমি পারবেই। ব..।'

রাতুল চেষ্টা চালাতেই লাগলো, 'ব...ব...বদরুল! নাহ এটা না।' রাতুল মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'ব...ব...ব...বাদল! নাহ এটাও না। আচ্ছা আংকেল, আমার মনে হয় আমি যদি একবার হাতির পিঠে চড়তে পারি তাহলে বাবার নামটা মনে আসবে আমার।'

আইডিয়াটা ফেলে দেবার মতো না। অনেক সময় স্মৃতি অনুসারে কাজ করলে স্মৃতি পুনুরুদ্ধার সম্ভব। অগত্যা সায়ন্ত রাতুলের জন্য হাঁতির পিঠে ওঠার টিকিট কিনে আনলেন। হাতির পিঠে চড়ে এক চক্কর ঘুরে এলো রাতুল। চক্কর শেষে নামার সময় রাতুল কিছুটা চিৎকার দিয়ে বলল, 'এখনো মনে পড়ছে না। তবে মনে পড়ার কাছাকাছি। আরেক চক্কর লাগালে পুরো নামটা মনে আসবে।'

আরেকটা টিকিট কিনলেন সায়ন্ত। তারপর আরেকটা। একে একে তিন চক্কর লাগানোর পর রাতুল নেমে এসে বললো, 'আংকেল মনে পড়েছে। আমার বাবার নাম বাসার, বাসার মুন্সী!'

রাতুল তার বাবার নাম মনে করতে পেরেছে বলে প্রচণ্ড খুশি হলেন সায়ন্ত। কপালে নেমে আসা ওর চুলগুলো তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'এবার দেখো তো, বাসার কথা মনে করতে পারো কিনা।'

দু চোখ উদাস করে ভাবতে লাগল রাতুল। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ একটু একটু মনে পড়ছে। আমাদের বাসা চিড়িয়াখানার আশে পাশে না। আমাদের বাসা এমন এক জায়গায় যেখানে শিশুরা নানা রকম মজা করে!'

সায়ন্ত অবাক, 'শিশুরা মজা করে, এটা আবার কোন জায়গা?'

'আমি চিন্তা করে দেখলাম, সেই জায়গায় ট্রেন আছে। গোল গোল যন্ত্র আছে, যেটাতে শিশুরা বসলেই ঘুরতে থাকে। খুব মজা লাগে। একটা বিশাল গোলক আছে, যেটাতে চড়ে উপরে ওঠা যায়, আবার নীচে নেমে আসা যায়।'

কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না সায়ন্ত, 'গোল জিনিসে বসলে মজা লাগে, সেটা আবার কেমন গোল জিনিস?' রাতুলের থুতনিটা উঁচু করে সায়ন্ত বেশ আন্তরিক গলায় বললেন, 'দেখো তো, জায়গাটার নাম মনে করতে পারো কিনা তুমি!'

রাতুল আবার উদাস হয়ে ভেবে কিছুটা নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'নামের সাথে শিশু শব্দটা আছে।'

'শিশু আছে! শিশু...শিশু...শিশুপার্ক?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শিশুপার্ক।'

'শিশুপার্কের কোথায় বাসা?'

'ঠিক শিশু পার্কে না। শিশুপার্কের কোনো এক পাশে হবে আমাদের বাসা। আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

সায়ন্ত আর দেরি করলেন না। চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি রাতুলকে নিয়ে। যত দ্রুত সম্ভব শিশুপার্কের কাছে যেতে হবে তাকে।

মাথা কাজ করছে না মিথিলার। নিশ্চয়ই টুনির বাবা কোনো বিপদে পড়েছে। তা না হলে তার নাম্বার থেকে ফোন করে একজন অচেনা লোক থানায় কেন যেতে বলবে তাকে। সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার হচ্ছে, ভদ্রলোক বলছে না যে, টুনির বাবার কী হয়েছে! এই মুহূর্তে বাসায় অনেক কাজ। স্কুল থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে বাসায় ফিরবে ইফতি। তার জন্য খাবার তৈরি করা হয়নি এখনো। গোসল করানো হয়নি টুনিকে। একটু পরে ঘর মোছা, থালা—বাটি ধোওয়ার জন্য বুয়া আসবে, কিন্তু ঘর বন্ধ করে তাকে যেতে হচ্ছে গুলশানে।

ঠাণ্ডা মাথায় এক এক করে সব সমস্যা সমাধান করার সিদ্ধান্ত নিলেন মিথিলা। এ সময় মাথা গরম করলে চলবে না। ফ্রিজে বেশ কয়েকটা আপেল আছে, কমলাও আছে। এগুলো দিয়ে দুপুরের খাবার সারতে পারবে ইফতি। দেরি না করে ইফতির স্কুলে ফোন করলেন তিনি। ফোন ধরলেন হেডস্যার স্বয়ং। সালাম দিয়েই মিথিলা বললেন, 'স্যার, আমি ইফতির মা বলছি। একটু সমস্যায় পড়েছি আমি। ওর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার আমার। কাউকে দিয়ে যদি একটু ডেকে দিতেন, প্লিজ।'

'ক্লাস সিক্সে যে পড়ে ওই ইফতি?'

'জি, স্যার।'

'একুট আগেই তো বোধহয় শেষ হলো ওদের ক্লাস। কোনো সমস্যা নেই, একটু ধরুন। ডেকে দিচ্ছি আমি ওকে।' হেডস্যার বললেন।

স্কুলের দপ্তরী ইফতিকে ডেকে আনল হেডস্যারের রুমে। হেডস্যার কাছে ডেকে ওর হাতে রিসিভার তুলে দিয়ে বললেন, 'তোমার মা ফোন করেছেন, কথা বলো।'

রিসিভার কানে নিয়ে ইফতি বলল, 'মামনি?'

খুব স্বাভাবিক গলায় মিথিলা বললেন, 'হ্যালো ইফতি, তোমার ক্লাস শেষ হয়েছে, বাবা?'

'হ্যাঁ মামনি, এই মাত্র শেষ হলো।'

'শোনো, আমি একটা জরুরী কাজে বাসার বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে খুব বেশি দেরী হবে না। পাশের বাসার সুপর্ণা আন্টির কাছে আমাদের বাসার চাবি রেখে গেলাম। তুমি বাসায় ফিরে তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে বাসায় ঢুকবে, কেমন?'

'আচ্ছা, মামনি।'

'আর ফ্রিজে কিছু ফল আছে। আপাতত সেগুলো খেয়ে নিও।। আমি তোমার জন্য আসার সময় বাইরে থেকে খাবার কিনে আনব।'

'তাহলে কিন্তু অবশ্যই পিজা আনবে।'

'আচ্ছা পিজাই আনব। ভালো কথা, তুমি কিন্তু বাসা থেকে একেবারেই বের হবে না। অপরিচিত লোক আসলে দরজা খুলবে না, ঠিক আছে?'

'আচ্ছা, খুলব না।'

'বুয়াকে আসতে নিষেধ করেছি আজ।'

'ভালো করেছ।'

'আরো একটা কথা, যে রুমে লাইট ফ্যানগুলো অন করা দরকার আমি সেগুলো অন করে রেখে যাচ্ছি। তুমি কোনো সুইচে হাত দেবে না।'

'আচ্ছা।'

'বাসায় যে মোবাইলটা আছে, সেটা সবসময় কাছে রাখবে। একটু পর পর ফোন করব আমি তোমাকে।'

'ওকে।'

'বেশ চিন্তা হচ্ছে আমার।'

'আমাকে নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না। আমি ভালোই থাকবো। তুমি সাবধানে যেও।' ইফতি একটু থেমে বলল,'আচ্ছা, টুনিও তো তোমার সাথে যাচ্ছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, টুনিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'টুনিকে নিয়ে যাওয়াই ভালো। বাসায় থাকলে ও শুধু আমাকে বিরক্ত করে, সারাক্ষণ এটা ওটা প্রশ্ন করে!'

'মোবাইল বন্ধ করে রাখব না। খবরদার, গেমসও খেলবে না। আমি টাইম টু টাইম তোমার খবর নিব, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'এখন রাখি?' মিথিলা খুব আদর করে বললেন, 'লক্ষ্মী ছেলে, আমার!'

পাশের বাসায় চাবিটা দিয়ে বাসার বাইরে চলে এলেন মিথিলা। গুলশানের ট্যাক্সি পেতে দেরি হলো না। মেয়েকে নিয়ে সিটে বসেই পার্স থেকে মোবাইল বের করলেন, ফোন দিলেন টুনির বাবার নাম্বারে। রিং বাজার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা রিসিভ হতেই মিথিলা বললেন, 'হ্যালো সাদাত সাহেব, আমি রওনা হয়ে গেছি। প্লিজ, আমাকে একটু বলবেন, আসলে কী হয়েছে? খুব দুঃশ্চিন্তায় আছি আমি।'

মৃত্যুর সংবাদ এভাবে দেওয়া যায় না, দেওয়া ঠিকও না, এটা জানেন সাদাত। কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে তাই তিনি বললেন, 'এই মুহূর্তে আমি আপনাকে কিছুই বলতে পারব না, ম্যাডাম। আপনি থানায় আসুন, নিজেই পুরো ব্যাপারটা জানতে পারবেন।'

'অন্তত একটু আভাস দিন।'

'সরি, আপনি আগে আসুন।' মোবাইল কেটে দিলেন সাদাত।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না মিথিলা। স্বামীর অজানা বিপদ নিয়ে ভাবতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন তিনি। মাকে হঠাৎ কাঁদতে দেখে টুনি জিজ্ঞেস করল, 'মা, তুমি কান্না করছ কেন?'

'এমনি কান্না করছি, মা।'

'এমনি কেন কান্না করছ?'

'আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে যে, তাই।'

'কাঁদতে ইচ্ছে করছে কেন?'

মিথিলা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না হঠাৎ। মায়ের একটা হাত টেনে ধরে টুনি বলল, 'বলো না, কাঁদতে ইচ্ছে করছে কেন তোমার?'

মেয়ের একটা হাত চেপে ধরে মিথিলা। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য তাকে বললেন, 'দেখো, রাস্তায় কত গাড়ি চলছে।'

'রাস্তায় গাড়ি চলছে কেন?'

'গাড়ি তো রাস্তাতেই চলে, মা। দেখো, রাস্তা কত লম্বা।'

'রাস্তাটা লম্বা কেন?'

মিথিলা কোনো জবাব দিলেন না। টুনি মায়ের হাত টেনে বলল, 'বলো না!' তিনি এবারও কোনো জবাব দিলেন না। সামনের দিকে তাকাল টুনি, 'রাস্তার মাঝে লম্বা লম্বা দাগ দিয়েছে কেন?' হঠাৎ সিগন্যালের দিকে চোখ যায় তার, 'রাস্তার উপরে সবুজ বাতি লাল বাতি জ্বলে কেন, মামনি?'

মিথিলা আর কথাই বলেন না, আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে কাঁদছেন তিনি। ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে আছে ক্যাবটা। বেশ জ্যাম আজ রাস্তায়। মিনিট পাঁচেক পর সিগন্যাল পেরুতেই বিকট একটা শব্দ হলো হঠাৎ। ড্রাইভার ট্যাক্সিটা থামিয়ে বিরস মুখে বললেন, 'আপা স্যরি, টায়ার ব্রার্স্ট হয়ে গেছে!'

জিভ বের করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন মিথিলা। রাস্তায় গাড়ির টায়ার ফেটে যাওয়া খারাপ লক্ষণ। শব্দ করে এবার কেঁদে উঠলেন মিথিলা।

স্কুল থেকে কিছুক্ষণ আগে বাসায় ফিরেছে ইফতি। পাশের বাসার আন্টির কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলল তারপর। নিজের রুমে ঢুকে কাঁধের ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিল বিছানায়। দ্রুত ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করল একটা। ঢকঢক করে সেখান থেকে পানি খেয়ে বোতলটা আগের জায়গায় রাখল, তারপর সিনেমার নায়কদের মতো কৌশলে পা দিয়ে লাথি মেরে বন্ধ করল দরজাটা।

টিভি ছেড়ে সোফার ওপর লাফ দিয়ে বসল ইফতি। বসাটা ঠিক রেসলিংয়ে দেখা লাফের মতো হলো না বলে উঠে দাঁড়িয়ে আবার লাফ দিল সোফায়। মনটা অসম্ভব ফুরফুরে এখন। বাসায় মা-বাবা কেউ নেই, কেমন যেন স্বাধীন স্বাধীন লাগছে। হঠাৎ কী হলো, উঠে দাঁড়াল সে আবার। টিভি বন্ধ করল। এরকম একটা দিনে ঘরে বসে থাকার কোনো মানেই হয় না। স্বাধীনতার দিনে স্বাধীনতাকে উদযাপন না করলে বিরাট লস।

বুদ্ধি পেতে দেরি হলো না ইফতির। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজ থেকে আরো কিছুটা ঠাণ্ডা পানি খেয়ে বের হলো সে বাসা থেকে। দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের পকেটেই রাখল তারপর।

বাসা থেকে বের হয়ে প্রথমেই সে হাজির হলো আদনানদের বাসার সামনে। আদনান আর সে একই স্কুলে পড়ে। শুধু কী তাই। তারা এক সাথে একই বেঞ্চে বসে এবং এক সাথে টিফিনের খাবার শেয়ার করে। আদনানের

বাবা মা দুজনই চাকরি করেন বলে দিনের বেলা বাসায় কখনই থাকেন না তারা। ইফতির ব্যাপারটা শুনে সে বলল, 'এটা আমার কাছে খুব মামুলি একটা ব্যাপার। আমার বাবা মা শুক্র আর শনিবার ছাড়া দিনের বেলা কখনই বাসায় থাকে না। এই ব্যাপারটাতে আমি আগে মজা পেতাম।' ঠোঁট উল্টিয়ে আদনান বলল, 'কিন্তু এখন আর পাই না।'

'তুই না পেলেও আমি কিন্তু উত্তেজনায় ভুগছি। আজ সারাদিন আমি ঘুরে বেড়াব। মন যেখানে যায় সেখানে যাব।'

'সত্যি তোর ঘুরতে ইচ্ছে করছে আজ?' আদনান ইফতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে চল, দুজনে মিলে ঝিলিকদের বাসা থেকে ঘুরে আসি।'

'কোন ঝিলিক, আমাদের ক্লাসের রোল নাম্বার একত্রিশ?'

'হ্যাঁ, ওদের বাসায় নাকি একটা পোষা ঈগল পাখি আছি। আমি আগে কখনো সামনা সামনি ঈগল পাখি দেখিনি। চল, এই সুযোগে দেখে আসি সেটা দুজনে।'

'কিন্তু ঈগল পাখি দেখতে গেলে তার জন্য কিছু নেয়া লাগবে না? অন্তত সৌজন্য বোধ হিসেবে একটা কিছু নেয়া দরকার না আমাদের!'

'হ্যাঁ, নেওয়া তো দরকারই। আমাদের পাশের ডোবা থেকে কয়েকটা ব্যাঙ ধরে নিয়ে গেলে কেমন হয়? ঈগলদের প্রিয় খাবার নাকি ব্যাঙ।'

ব্যাঙ ধরার জন্য ইফতি আর আদনান ডোবার সামনে এলো। চোখ বড় বড় করে ফেলল ওরা সঙ্গে সঙ্গে। ডোবা কই? ডোবা নেই। কারা যেন মাটি ফেলে ভরাট করে রেখেছে। ইফতি কিছুটা চিন্তিত হয়ে বলল, 'এখন উপায়!'

'কোনো উপায় নেই।' আদনান জবাব দিল।

'বিকল্প কিছু নিয়ে যাব কী?' ইফতি আদনানের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'আচ্ছা ঈগল কি চানাচুর খায়?'

'জানি না তো! মাছ-টাছ খায় বোধহয়। চানাচুরও খেতে পারে।'

'তাহলে কি এক প্যাকেট চানাচুর নিয়ে নিব?'

'সব বাদ দিয়ে চল বাজার থেকে মাছ কিনে নিয়ে যাই। টাকা আছে না তোর কাছে?'

'আছে।'

'আমার কাছেও আছে।'

ঝিলিকদের বাসার সামনে এসে কলিং বেল টিপল আদনান। কিন্তু দরজা খুলছে না কেউ। ওর হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ। ঈগলের জন্য খাবার আনা হয়েছে এতে। ঝিলিককে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য ব্যাগটা পেছনে লুকিয়ে রেখেছে সে।

দ্বিতীয়বার কলিংবেল বাজানোর আগেই দরজা খুলে দিল ঝিলিকই । ওদের দেখে খুব আনন্দ নিয়ে বলল, 'আরে আদনান, তুই! ইফতিকেও তো দেখছি! কী ব্যাপার?'

'তোদের ঈগলটা দেখতে এলাম। সবসময় দূর থেকে ঈগল দেখেছি, আজ কাছ থেকে দেখব।' হাসতে হাসতে বলল আদনান।

'ভেতরে চলে আয়। বাসায় আজ কেউ নেই। আমি একদম একা। ঈগলটাকে নিয়েই খেলছিলাম এতক্ষণ।' ঝিলিকের চেহারায় খুশির ঝিলিক।

পেছনে লুকানো মাছের ব্যাগটা বের করে ঝিলিকের সামনে ধরল আদনান, 'বল তো, এটা কি?'

ঝিলিক নাক চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী এটা?'

'মাছ। আমি জানি, ঈগলরা মাছ পছন্দ করে। ডিসকভারীতে দেখেছি, ওরা নদী থেকে কিভাবে ছোঁ মেরে মাছ ধরে নিয়ে যায়। আচ্ছা, তোদের ঈগল মাছ খায় তো?' ইফতি বলল।

'অবশ্যই মাছ খায়।'

খুব যত্ন করে ঈগলটাকে মাছ খাওয়াচ্ছে আদনান, পাশে বসে ইফতি আর ঝিলিক তা দেখেছে। একে একে অনেকগুলো মাছ খাওয়ালো সে ঈগলটাকে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো আধা ঘণ্টা পর। কেমন যেন ঝিমুনি ভাব করা শুরু করল পাখিটা। হঠাৎ টলতে লাগল সে। তার ঠিক পাঁচ মিনিট পর টুপুৎ করে পড়ে গেল নিজের খাঁচার মধ্যেই।

পাখির এই দশা দেখে ভয় পেয়ে গেল ঝিলিক। ভয় পেলো আদনান আর ইফতিও। দেরি না করে ঝিলিক তার বাবা মাকে পাখির খবর জানানোর জন্য ফোন করতে ভেতরের ঘরে গেল। সরে পড়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ!

সুযোগটাকে মিস করলো না ইফতি আর আদনান। বাসা থেকে বেরিয়ে এলো তারা নিঃশব্দে।

কিছুদূর আসার পর ইফতি বলল, 'পাখিটা কি মরে গেল!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'মরল কেন?'

'ওগুলো বোধহয় ফরমালিন দেওয়া মাছ ছিল। দেখলি না, কেমন শক্ত ছিল মাছগুলো!'

'পাখিটা মুখ দিয়ে কেমন যেন ফেনা বের হচ্ছিল।' ভয় ভয় গলায় ইফতি বলল, 'আজ আর ঘোরাঘুরি করার দরকার নেই, তুই বাসায় চলে যা, আমিও বাসায় চলে যাই।'

থানার বেঞ্চে এখানো বসে আছেন সাদাত। মিথিলা না আসা পর্যন্ত বাড়ি যেতে পারছেন না তিনি। আসলে পুলিশ তাকে যেতে দিচ্ছে না। মৃতের পকেটের টাকা কোথায় গেল সে বিষয়ে একটা তদন্ত হবে বলে সাব ইন্সপেক্টর কুরবান আলী একটু আগে জানিয়ে গেছেন। অবশ্য মৃতের পরিবারের কেউ যদি বলে, তার পকেটে টাকা ছিল না, তাহলে পুলিশের কোনো আপত্তি থাকবে না, সাদাতকে যেতে দেবে তারা তখন।

পাশে বসে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে মিমনি। একটা বই অলরেডি সে শেষ করে ফেলেছে, আরেকটা শুরু করেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। হঠাৎ সে বই থেকে চোখ সরিয়ে সাদাতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অংক জিনিসটাই খুব মজার। আচ্ছা বাবা-।' মিমনি একটু পাশ ফিরে বসে বলল, 'অংকে তুমি কেমন ছিলে বাবা? কাঁচা, না পাকা।'

মাথার ভেতর কুটকুট করছে টেনশন। মেয়ের কথা শুনে একটু বিরক্ত হ্লেন, কিন্তু প্রকাশ করলেন না। চেহারাটা স্বাভাবিক রেখে বললেন, 'ভালোই ছিলাম। এসএসসিতে লেটার পেয়েছিলাম।'

'তাহলে তো ভালোই ছিলে।' কোলের ওপর ভাঁজ করে রাখা বইটা মেলে ধরে মিমনি বলল, 'এবার তোমাকে একটা অংক বলি। দেখি, উত্তর দিতে পারো কি না তার।'

সাদাত শান্ত গলায় বললেন, 'অংকটা পরে বললে হয় না?'

'হয়। তবে আমার এখনই বলতে ইচ্ছে করছে যে বাবা!'

মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে সাদাত বললেন, 'ঠিক আছে বলো।'

মিমনি বাবার হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলল, 'বাবা, তুমি কি খুব টেনশন করছ?'

সাদাত হ্যাঁ বলতে নিয়েই মুখটা হাসি হাসি করে বললেন, 'না।'

'পুলিশ আংকেলরা কি কিছু বলেছে তোমাকে?'

'না, তেমন কিছু বলেননি।'

'তাহলে চুপচাপ বসে থাকো বাবা। যে আন্টিকে ফোন করলে না তুমি, তিনি আসলেই তাকে সবকিছু বুঝিয়ে বাসায় চলে যাব আমরা। আম্মু বোধহয় টেনশন করছে। সেই কখন বাসা থেকে বের হয়েছি আমরা! বাজারগুলোও হারিয়ে ফেললাম।'

'তোমার আম্মুকে একটা ফোন করা দরকার।'

'ফোন করবে কি করে বাবা! আম্মুর মোবাইল তো কদিন ধরে নষ্ট। পাশের বাসার ভাড়াটেরা নতুন এসেছে, ওদের ফোন নম্বরও তো জানা নেই আমাদের।'

মেয়ের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে সাদাত বললেন, 'তুমি বরং তোমার অংকটা বলো, দেখি, সঠিক উত্তরটা বলতে পারি কি না।'

মুখটা হাসি হাসি করে বইয়ের দিকে তাকাল মিমনি। দু-তিনটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সে বলল, 'স্বপন আর রতন নামে দুই ভাই লিচু চুরি করতে এসে ধরা পড়ল। বয়স কম দেখে লিচু গাছের মালিক তাদেরকে বললেন, যাও, এখনকার মতো ছেড়ে দিচ্ছি। লিচুই যখন চুরি করতে এসেছ, তাহলে ২০টা করে লিচু নিয়ে যাও তোমরা।

খুশি মনে গাছে উঠে লিচু পাড়তে লাগল স্বপন আর রতন। কিছুক্ষণ পর স্বপন রতনকে বলল, ২০টা হয়েছে তোমার? রতন বলল, এখনো হয়নি। কিন্তু এখন যতগুলো আছে যদি তার দ্বিগুণ নেই এবং এখন যতগুলো আছে তার অর্ধেক নেই, তাহলে দুইয়ে মিলে ২০ হবে।' মিমনি বই থেকে বাবার দিকে তাকাল, 'বলো তো, রতনের কাছে এখন কতগুলো লিচু আছে?'

সাদাত গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করলেন অংকটা নিয়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারলেন না। মাথার ভেতর মৃত মানুষটা কুটকুট করেছ, সাব—ইন্সপেক্টর কুরবান আলীও একটু পর পর খোঁচা দিচ্ছেন মগজে। আরো কিছুক্ষণ ভাবার পর হতাশার স্বরে সাদাত বললেন, 'পারব না, মা।'

খুব উৎফুল্ল হয়ে মিমনি বলল, 'খুব সহজ বাবা। ৮টি লিচু ছিল রতনের কাছে। ৮-এর দ্বিগুন ১৬, আর ৮-এর অর্ধেক ৪। ১৬ আর ৪, মোট ২০।' মিমনি বইয়ের আরেকটা পাতায় গেল, 'ঠিক আছে তোমাকে আরেকটা অংক বলি। আজ থেকে ৪ বছর পরে আমারে যে বয়স হবে তার দ্বিগুণ থেকে, ৪ বছর আগে আমার যে বয়স ছিল তার দ্বিগুণ বিয়োগ করলে, যেটা পাওয়া

যাবে, আমার বর্তমান বয়স সেটাই।' মিমনি আবার বাবার দিকে তাকাল, 'আমার বর্তমান বয়স কত, বলো তো?'

সাদাত আবার চেষ্টা করলেন এবং যথারীতি মাথা এদিক করে বললেন, 'না মা, এটাও পারব না।'

মিমনি আগের মতোই প্রচণ্ড উৎফুল্ল হয়ে বলল, '১৬। ১৬ বছর।' বাবাকে শান্তনা দেওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল, 'ওকে বাবা, তোমাকে বরং আমি আরেকটা অংক বলি। এক ডিম- ।'

অংকটা বলতে পারল না মিমনি। তার আগেই এক পুলিশ-সেপাই এসে সাদাতের সামনে দাঁড়ালেন, 'আপনার নাম সাদাত?'

কিছুটা তটস্থ্ হয়ে সাদাত বললেন, 'জি।'

'ওসি স্যার আপনাকে ডাকে। আমার সাথে চলুন।'

ওসি সারোয়ার আলীর রুমে ঢুকতেই শরীরটা জুড়িয়ে গেল সাদাতের। এসি লাগানো রুম। পরিপাটি ভাবে সাজানো। ফ্লোর কার্পেটিং করা। ওসিদের ভুড়ি বড় হয়, কিন্তু এনার কোনো ভুড়ি নেই।

ওসি সাহেব যার পর নাই বিনয়ী মানুষ। সাদাতকে রুমে ঢুকতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। হ্যান্ডশেক করার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মিস্টার সাদাত, হাউ আর ইউ?'

ওসি সাহেবের আচরণে একটু সাহস পেলেন সাদাত। তবুও ভয় করছে তার। কাঁপা কাঁপা গলায় সাদাত বললেন, 'জি স্যার, ফাইন।'

ভয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ওসি সারোয়ার আলী, 'ভয় পাচ্ছেন কেন? ইজি হয়ে বসুন। আপনি আমাদের যতটা খারাপ ভাবছেন, আমরা কিন্তু ততটা খারাপ নই।'

সাদাত সাহসী ভাব দেখানোর জন্য কিছুটা হাসার চেষ্টা করলেন, 'ভয় পাবো কেন স্যার? আপনারা তো বাঘ-ভাল্লুক না যে খেয়ে ফেলবেন! আপনারাও তো আমাদের মতোই মানুষ।'

ওসি সাহেব হেসে ফেললেন, 'খুব ভালো বলেছেন। এবার বলেন, কী খাবেন, ঠাণ্ডা না গরম? আমাদের এখানে সব কিছুর ব্যবস্থা আছে।'

'স্যার, পানি খাব। এক গ্লাস পানি হলেই চলবে।'

'পানি খাবেন? গুড, পানি খান। কথাবার্তার শুরুতে পানি খাওয়া ভালো।' দরজার দিকে তাকিয়ে গলার আওয়াজ বাড়িয়ে ওসি সারোয়ার আলী বললেন, 'এই কে আছিস, এক বোতল মিনারেল ওয়াটার নিয়ে আয়।'

মিনারেল ওয়াটার এসে গেল একটু পরেই। বোতল খুলে ঢক ঢক করে পানি পান করলেন সাদাত। এখন একটু ভালো লাগছে তার। খানিকটা সাহস পাচ্ছেন মনে। হাতের বোতলটা টেবিলের উপরে রেখে ওসি সাহেবের দিকে তাকালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ওসি সাহেব বললেন, 'তাহলে দেরি না করে কথা বার্তার শুভ সূচনা করা যাক।'

'জি স্যার।'

'আপনি এক ভদ্রলোককে রাস্তা থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন তার চিকিৎসা সেবা দেবার জন্য। ঠিক?' ওসি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

'জি স্যার।'

'ঘটনা চক্রে লোকটা মারা গেলেন। ঠিক?'

হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন সাদাত।

'লোকটাকে তারপর এই থানায় নিয়ে আসলেন। ঠিক?'

আবারো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন সাদাত।

'নিহত লোকটাকে আমি দেখেছি। পরিপাটি পোষাক। ভদ্রলোকের মতোন চেহারা। পকেটে থেকে চমৎকার একটা ফোনও উদ্ধার করা হয়েছে, যার দাম বিশ পঁচিশ হাজার টাকা। যে ফোনটা এখন আপনার কাছে আছে।' ওসি সাহেব বিশেষ ভঙ্গিমায় সাদাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক?'

'জি, একদম ঠিক।'

'এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে, সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়—নিহতের পকেটে কোনো টাকা—পয়সা পাওয়া যায়নি।' ওসি সাহেব এবার চোখ দুটো একটু সরু করে সাদাতের দিকে তাকালেন, 'তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে, কোনো টাকা-পয়সা নিয়ে বের হননি তিনি!' ওসি সাহেব থামলেন। সাদাতের দিকে একটু ঝুকে বসে বললেন, 'ঝামেলা বেধেছে এই জায়গাাতেই। এরকম পরিপাটি পোষাকের একটা লোক চালান ছাড়া রাস্তায় বের হবে, ব্যাপারটা কি মেনে নেওয়ার মতো? না মেনে এটা নেওয়া যায়!'

সাদাত বুঝতে পারছেন না কী বলবেন তিনি। তবুও হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, 'না, আসলেই মেনে নেওয়া যায় না।'

'গুড'। ওসি সাহেব আশ্বস্থ হলেন, 'আপনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ বলে সব কিছু প্রথমবারেই বুঝতে পেরেছেন। অনেকে আবার এসব বোঝে না, তখন তাদের বিশেষ ব্যবস্থায় বোঝাতে হয়।'

'জি স্যার।' সাদাত সায় দিলেন।

'আমরা তদন্ত করে দেখেছি, ভদ্রলোকের কাছে বিশ হাজার টাকার মতো ছিল। সেই টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের ধারণা টাকা সরানোর ঘটনা আপনি নিজে ঘটিয়েছেন। ভদ্রলোক বলে আপনার নামে মামলা দিচ্ছি না। অতএব-।' ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসলেন ওসি সাহেব, 'দেরি না করে টাকাটা দিয়ে দিন। তারপর আপনার মুক্তি।'

ওসি সাহেবের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন সাদাত, 'কিন্তু স্যার, আমি টাকা সরানোর সাথে জড়িত নই। আমার মনে হয় আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার আগেই কাজটা অন্য কেউ করেছে।'

'না আ আ আ, কথাটা গিলতে পারলাম না।' ওসি সাহেব অবিশ্বাসীর মতো মাথা এদিক-ওদিক নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'কাজটা আপনার নূরানি হাতেই সম্পন্ন হয়েছে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাছাড়া ভদ্রলোকের সারা শরীরে আপনার ফিংগার প্রিন্ট পাওয়া গেছে। এবার কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন?'

'সারা শরীরে ফিংগার প্রিন্ট তো থাকবেই স্যার। লোকটাকে আমি রাস্তা থেকে তুলে সিএনজিতে বসিয়েছি। আবার সিএনজি থেকে নামিয়ে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেছি। এই সময় আমার ফিংগার প্রিন্ট তার শরীরে লেগেছে স্যার।' সাদাত কাতর হয়ে বললেন।

'আমাকে কি আপনার ছেলে মানুষ মনে হয়?'

'না।'

'তাহলে ওসব ছেলে—ভুলানো কথায় কাজ হবে না, সাদাত সাহেব। কার ফিংগার প্রিন্ট কখন কোথায় কীভাবে লাগে, তা শেখানোর চেষ্টা করবেন না আমাদের। আমরা এসব আপনার চেয়ে অনেক ভালো বুঝি।' ওসি সাহেব কিছুটা রূঢ় স্বরে বললেন, 'আপাতত হাজতে পুরছি না আপনাকে। চুপচাপ বারান্দার আগের চেয়ারটাতে গিয়েই বসুন। বসে বসে টাকা ম্যানেজ করুন। খবরদার, পালানোর চেষ্টা করবেন না! তিন তিনটা সাদা পোশাকের পুলিশ আপনার দিকে নজর রাখছে। যান—।' ওসি সারোয়ার আলী আবার হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়ালেন সাদাতের দিকে। সাদাত ইতস্তত ভঙ্গিতে হাত বাড়াতেই তিনি টেনে নেওয়ার মতো হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, 'আপনার সময় দুপুর দুইটা পর্যন্ত।'

বাসার সাহেবের বাসার সামনে লোকে লোকারণ্য। ফায়ার সার্ভিসের তিনটি গাড়ি সাইরেন বাজাচ্ছে অনবরত। একটা এ্যাম্বুলেন্সও দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তুতি নিয়ে, পুড়ে যাওয়া কাউকে পাওয়া মাত্র দৌড়াতে শুরু করবে সেটা হাসপাতালের দিক।

ভীড় ঠেলে তাদের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন বাসার মুন্সী আর নাজমা আয়েশা। একটু দ্রুতই ঢুকলেন। কিন্তু অবাক হলেন তারা। আগুন লাগার চিহ্ন নেই কোথাও। দেয়ালগুলোতে নেই কালো ধোঁয়ার ছাপ। তবে একটা পোড়া গন্ধ লেপ্টে আছে বাতাসে।

দ্রুত সবগুলো রুমে খোঁজ নিতেই দেখেন, রাতুলের দাদী বসে আছেন তার বেডরুমে।। ছেলে আর ছেলের বৌকে দেখে বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'অল্পের জন্য বেঁচে গেছি, বাবা।'

'রাতুল কোথায়, মা?' উদ্বিগ্ন হয়ে একমাত্র ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলেন বাসার মুন্সী।

'ও তো সেই সকাল থেকেই বাসায় নেই। তোরা অফিসে যাবার জন্য বেরিয়েছিস, তার একটু পরে বন্ধুর বাসায় যাবার কথা বলে ও বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি।'

'ওর মোবাইল কোথায়?'

'মোবাইল তো বাসায় রেখে গেছে ও।'

'জিল্লু? ও কোথায়, মা?' শাশুড়ির পাশে বসে কাজের ছেলের ব্যাপারে জানতে চাইলেন নাজমা আয়েশা।

'ওই তো সব ঘটনার মূল।'

'তার মানে!'

'চা বানানোর জন্য চুলায় দুধ দিয়ে সোফায় এসে বসেছি।' ঘটনা বলতে শুরু করলেন রাতুলের দাদি, 'জিল্লুকে বললাম, আমাকে এক গ্লাস পানি দিতে। পানি এনে দিলে ও। সেটা খাওয়ার পর তারপর আর কিছু মনে নাই।'

'কী বলছেন, মা'! জিল্লু এমন কাজ করেছে! আপনার পানিতে ঘুমের ঔষধ মিশিয়েছে ও?' রাগে লাল হয়ে গেছে নাজমা আয়েশার চেহারা।

'ওদিকে চুলায় ছিল দুধ। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনের তাপে দুধ পুড়তে শুরু করল। সেই পোড়া ধোঁয়া জানালা দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে গেল। তাই দেখে সবাই ধারণা করেছে, বাসায় আগুন লেগেছে।'

'জিল্লু আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে পারল!' নাজমা আয়েশা দুঃখী দুঃখী গলায় বললেন, 'কত ভালোবাসি আমরা ওকে। আমরা যা খাই ওকে তাই খাওয়াই! ভালো ভালো পোশাক পরাই।'

'যাওয়ার সময় নিশ্চয় অনেক কিছু নিয়ে গেছে ও।' রাতুলের দাদি ছেলের বউকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখো তো যাওয়ার সময় কী কী নিয়ে গেছে ও। শয়তানটারে পেলে কান টেনে এবার ছিঁড়ে ফেলব আমি। '

বাসার মুন্সীর বাসায় তিনটা ফ্রিজ, দুটো কিচেনে, একটা তার বেডরুমে। কিচিনের দুটো নন ফ্রস্ট, বেডরুমেরটাতে বরফ জমা হয়। এই ফ্রিজটা কেনাই হয়েছে বরফ জমানোর জন্য। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন বরফ দরকার পড়ে বাসার সাহেবের। আর এ দরকারটা পড়ে তার অহেতুক টেনশন এবং হঠাৎ হঠাৎ রেগে যাওয়ার কারণে। রক্তে সুগার আছেই তার, প্রেশারও আছে প্রচণ্ড। একবার প্রেশার উঠে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, যায় যায় অবস্থা! ভাগ্যিস, ডাক্তার দ্রুত বাসায় এসেছিলেন, বরফ ছিল না তখন, ঠাণ্ডা পানির বোতল চেপে ধরেছিলেন তার ঘাড়, মাথা, শরীরে। তারপর থেকে ডাক্তার বলেছেন, ঘরে সব সময় বরফ রাখতে এবং বরফ জমানো একটা ফ্রিজ রাখতে।

ফ্রিজ থেকে দ্রুত কিছু বরফ বের করে একটা আইস ব্যাগে ভরলেন নাজমা আয়েশা। তারপর স্বামীর মাথার ওপর রেখে বললেন, 'বাসার, রিল্যাক্স।'

বাসার সাহেব ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'এই সময় তুমি আমাকে রিল্যাক্স থাকতে বলছ! এখন রিল্যাক্স থাকার সময়, না রিল্যাক্স কেউ থাকতে পারে!'

'আর কেউ না পারুক, তোমাকে পারতে হবে।' নাজমা আয়েশা আইস ব্যাগটা আরো একটু জোরে চেপে ধরে বললেন, 'তুমি একদম কথা বলবে না, আমি যা বলি শুধু তার উত্তর দেবে।'

মোবাইলটা বেজে ওঠে বাসার সাহেবের। ওদিকে হাত বাড়াতেই নাজমা আয়েশা বলেন, 'না, তুমি এখন মোবাইলও রিসিভ করবে না। আমি রিসিভ করছি।' বিছানার পাশে থাকা মোবাইলটা হাতে নিলেন নাজমা আয়েশা, 'হ্যাঁ, বলুন ম্যানেজার সাহেব।'

'ম্যাডাম, আগুনের অবস্থা কী ?'

'এখন ভালো। আর কিছু বলবেন আপনি?'

'না।'

মোবাইলটা কেটে দিয়ে নাজমা আয়েশা বাসার সাহেবের দিকে তাকালেন, 'একটা এগার-বারো বছরের ছেলে বাসা বাইরে যাওয়ার পর আবার ফিরে না আসলে তাকে মিসিং কেস বলে না। রাতুল কোথায় কোথায় যেতে পারে তার একটা লিস্ট করব আমরা। তারপর একটা একটা করে খোঁজ নেব সেসব জায়গায়। আইস ব্যাগটা তুমি ধরো, আমি কাগজ আর কলম নিয়ে আসি।' আইস ব্যাগটা বাসার সাহেবের হাতে দিয়ে কাগজ কলম আনলেন নাজমা আয়েশা। স্বামীর সামনাসামনি বসে বললেন, 'আমি একটা একটা করে বলব, তুমি কমেন্টস করো। এক. বনানী বড় ভাইয়ার বাসা-।'

কথা শেষ করতে পারলেন না নাজমা আয়েশা। বাসার সাহেব বললেন, 'ওখানে খোঁজ নিয়েছি। রাতুল ওখানে যায়নি।'

'দুই. মিরপুরে ফুপুর বাসা।'

'ওখানে খোঁজ নেইনি। কারণ মিরপুর বেশ দূরে। রাতুল অতদূর চিনবেও না, যেতেও পারবে না।'

'তিন. ওর বন্ধুদের বাসা।'

'ওর বন্ধুদের ফোন নাম্বার তো আমি জানি না। ওর স্কুলে আমি কখনো যাইনি। তুমিই নিয়ে যেতে, এখন ড্রাইভার নিয়ে যায়। তবে ওর কিছু বন্ধুর মাকে তো তুমি চেনো। তাদের ফোন নাম্বার নিশ্চয় তোমার কাছে আছে।'

'তা আছে।' নাজমা আয়েশা মোবাইলটা হাতে নিয়ে বললেন, 'এখন খোঁজ নেব, না আমাদের লিস্টটা শেষ করে খোঁজ নেব?'

'লিস্টটা আগে শেষ করো।'

মোবাইলটা আবার পাশে রেখে নাজমা আয়েশা বললেন, 'চার. ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতাল।'

'আমি অলরেডি আমাদের সুপারভাইজার হেকমত সাহেবকে বলে দিয়েছি। গাড়ি নিয়ে তিনি বের হয়ে গেছেন।'

'পাঁচ, বিভিন্ন পার্ক।'

'ওখানেও লোক পাঠিয়েছি। আমাদের অফিসের ফাহিম আছে না, ওর সঙ্গে রাতুল অনেকবার অনেক পার্কে বেড়াতে গেছে। ফাহিম আর অফিসের চিফ গার্ডকে সেসব জায়গায় পাঠিয়েছি। জিল্লুকেও ফাহিম চেনে।'

'গাড়ি নিয়ে গেছে ওরা?'

'হ্যাঁ, নতুন মাইক্রোটা নিয়ে যেতে বলেছি।'

'গুড।' নাজমা আয়েশা কাগজের দিকে তাকালেন, 'ছয়. বিভিন্ন থানা।'

বাসার সাহেব মাথার আইস ব্যাগটা দ্রুত সরিয়ে ফেলে মোবাইলটা হাতে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাজমা আয়েশা বললেন, 'কাকে ফোন করছ তুমি?'

'সারোয়ারকে।'

'কোন সারোয়ার?'

'আমার বন্ধু সারোয়ার। তুমি চেনো, গুলশান ১ নাম্বার ওসি।'

গুলশান থানার থানার ওসি সারোয়ার আলী প্রায় পনের মিনিট ধরে কথা বলছেন মোবাইলে। একটা ট্রাক আটকানো হয়েছে মহাখালীর মেইন রাস্তার এক পাশে। ওখানকার কর্তব্যরত পুলিশ বলতে পারছেন না ত্রিপলে ঢাকা ওই ট্রাকে কী আছে। কারণ ট্রাকটা আটকানোর পরপরই ড্রাইভার পলাতক।

বাইশ মিনিট কথা বলার পর কান থেকে মোবাইলটা সরালেন তিনি। বড়ই আনন্দিত দেখাচ্ছে এখন তাকে। চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে সামনের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটো দশ-বারো বছরের দুটো ছেলেকে নিয়ে রুমে ঢুকলেন সাব ইন্সপেক্টর কুরবান আলী। ওসি সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'স্যার, এ দুটো ছেলেকে গুলশান পার্কের কোনায় দুটো অস্ত্রসহ পাওয়া গেছে।'

'তাই নাকি!' সোজা হয়ে বসলেন ওসি সারয়ার আলী, 'একটাকে তো ছাত্র বলে মনে হচ্ছে। হাতে কী অস্ত্র ছিল?'

'একটা ছুরি, আর একটা পিস্তল।'

'পিস্তল!' চমকে উঠলেন সারোয়ার আলী।

'জি স্যার। তবে পিস্তলটা আসল না নকল বুঝতে পারছি না।'

'আসল নকল পরে বোঝা যাবে, আগে ওই দুইটারে লকাপে ঢুকাও।' কান বিস্তৃত হাসি দিলেন সারোয়ার আলী। মোবাইলটা আবার বেজে উঠল তার। আলতো করে সেটা হাতে নিয়ে হাসিটা আরো বিস্তৃত করে রিসিভ করলেন তিনি, 'আরে বন্ধু যে, কতদিন পর মাই ডিয়ার বাসার!'

'সারোয়ার, আমি তো কঠিন একটা সমস্যায় পড়েছি দোস্ত!'

'তা তো বুঝতেই পারছি।' সারোয়ার সাহেব ফোনটা কান বদল করে বললেন, 'কঠিন সমস্যায় না পড়লে কেউ তো আর আমাকে ফোন করে না। তা সমস্যাটা কী?'

'বাসার কাজের ছেলেটা আমার মাকে অজ্ঞান করে মোবাইল ফোন, টাকা পয়সা চুরি করে নিয়ে গেছে। এদিকে আমার একমাত্র ছেলে রাতুলকেও খুঁজে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে, রাতুলকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে জিল্লু!'

'কাজের ছেলেটার নাম জিল্লু?'

'জি।'

'ছবি আছে ওদের?'

'জি, আছে।'

'ছবি দুটো নিয়ে দ্রুত থানায় চলে আসো। দেখি কী করতে পারি আমি।' সারোয়ার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'তা, তোমার ছেলের কি বিয়ের বয়স হয়েছে?'

'আরে না, আগামী মাসে বারো বৎসরে পড়বে ও।'

'তাহলে ওকে পাওয়া যাবে। বিয়ের বয়সের ছেলেরা মাঝেমাঝে বাসা থেকে হাওয়া হয়ে যায়, আর বাচ্চারা যায় কোনো অ্যাডভেঞ্চারে। আশেপাশেই কোথাও হয়তো আছে, খুঁজে দেব। দেরি করো না, এখনই চলে আসো। তা, ভাবী ভালো আছে তো!'

রাতুলের হাত ধরে শিশুপার্কের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সায়ন্ত। মন খারাপ তার। আশে পাশে কোনো আবাসিক এলাকা দেখা যাচ্ছে না।

সায়ন্তর দেখাদেখি রাতুলেরও মন খারাপ। মুখ ভার করে সেও দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা খেয়াল করলেন সায়ন্ত। ছেলেটার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'মন খারাপ করো না, রাতুল। তোমার বাসা খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমি আছি তোমার সাথে। এভাবে বাসা না পেলে পত্রিকায় তোমার ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দেব। তখন নিশ্চয়ই তোমার পরিবারের কোনো না কোনো সদস্যদের চোখে পড়বে সেটা। তাদের চোখে না পড়লে তোমার পরিচিত কারো চোখে পড়বে। সুতরাং তোমার বাড়ি ফেরাটা শুধু সময়ের ব্যাপার। মন খারাপ করার কিছু নেই। এবার হাসো।'

রাতুল সত্যি হেসে ফেলল, 'কিন্তু আমাদের বাসায় কোন পত্রিকা রাখে তা তো আমার মনে নেই আংকেল।'

'দেশের সবগুলো পত্রিকায় তোমার ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেব, ঠিক আছে?' রাতুলকে আশ্বস্ত্ করার চেষ্টা করল সায়ন্ত, 'তার আগে আমাদের উচিত আশে পাশের লোকজনের কাছে গিয়ে তোমার ব্যাপারে খোঁজ করা।'

'জি। আমার বাসা যদি এদিকেই হয়, তাহলে শিশুপার্কে যাব না, এমন হওয়ার কথা না। আমার মনে হচ্ছে, ঘন ঘনই যাব। আমরা বরং শিশুপার্কের ভেতরে ঢুকে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।' রাতুল বুদ্ধি দিল সায়ন্তকে।

দুটো টিকিট কেটে রাতুল এবং সায়ন্ত শিশুপার্কের ভেতরে প্রবেশ করলেন। প্রথমেই তারা হাজির হলেন মেরি গো রাউন্ডের সামনে। সেটার অপারেটর চিনতে পারলেন না রাতুলকে। এমনকি যারা শিশুদের মেরি গো রাউন্ডে উঠতে সাহায্য করেন, পারলেন না তারাও। এদিকে টিকিট যখন

কাটা হয়েই গেছে তখন আর বসে থেকে লাভ কি। রাতুলকে নিয়ে মেরি গো রাউন্ডে উঠে বসলেন সায়ন্ত।

মেরি গো রাউন্ডে চড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল রাতুল। কী চমৎকার ভাবে উপরে-নিচে ওঠা নামা করছে ঘোড়াগুলো। তার সাথে সাথে বাজছে কান ফাটানো মিউজিক। খুব উপভোগ করছে বাচ্চারা। ছেলের কথা মনে পড়ে গেল সায়ন্তর। এরকম একটা জায়গায় আসতে পারলে সেও নিশ্চয়ই রাতুলের মতো খুশি হতো। কিন্তু কাজের চাপে ওদের নিয়ে কোথাও যাবার সময়ই পান না। মন খারাপ করে ফেললেন তিনি।। এমনিতে এই শহরে বাচ্চাদের খেলার কোনো জায়গা নেই। সারাদিন পড়ালেখা আর লেখাপড়া। মাঝে মাঝে পড়ালেখার চাপ থেকে সরিয়ে বাচ্চাদের এসব জায়গায় নিয়ে এলে মনটা ফ্রেশ হয় তাদের। এনার্জি বাড়ে। নিজের ছেলেটাকে এতদিন না নিয়ে আসার কথা চিন্তা করে মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

মেরি গো রাউন্ড শেষ করে দুজনে গেলেন টয় ট্রেনের কাছে। লম্বা লাইন। বাচ্চাদের সাথে তাদের অভিভাবকরাও দাঁড়িয়ে আছেন লাইনে। সায়ন্ত মানুষের লাইন এড়িয়ে ট্রেনের ড্রাইভারের কাছে চলে এলেন। ছোট্ট ট্রেন হলে হবে কি, বড় ট্রেনের মতোই ভট ভট শব্দ করতে পারে এটি। সেই শব্দ ছাপিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বাচ্চাটাকে আগে কখনো দেখেছেন, ভাই সাহেব?'

পান খাচ্ছিলেন ড্রাইভার ভদ্রলোক। সায়ন্তকে কিছু বলতে দেখে মাথাটা এগিয়ে এনে বললেন, 'দশ টাকা করে দেন। টিকিট আর লাইন ছাড়াই ট্রেনে তুলে নিচ্ছি।'

সায়ন্ত ড্রাইভার ভদ্রলোককে হাতের টিকিট দেখিয়ে বললেন, 'আমি টিকিট আগেই কিনেছি। আপনি শুধু আমাকে বলেন, এই বাচ্চাটাকে আগে কখনও দেখেছে কি না।'

ড্রাইভার এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুটা মন খারাপ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'টিকিটই যখন কিনেছেন, তখন আমার কাছে এসেছেন কেন? যান লাইনে দাড়ান।'

সায়ন্ত বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'আমি সে কথা বলছি না, ভাইজান। এই বাচ্চাটাকে দেখেন। পথ চলতে চলতে হারিয়ে গেছে সে। আপনার যদি

মনে হয় একে আগে কখনো দেখেছেন, তাহলে হয়তোবা এর গার্জিয়ানদের আমি খুঁজে বের করতে পারব।'

ড্রাইভার সাহেব কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর মাথাটা সায়ন্তের দিকে এগিয়ে এনে চেঁচিয়ে বললেন, 'জি, আমি এই গাড়ির ড্রাইভার।'

ড্রাইভারের কথার আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারলেন না সায়ন্ত। এরই মধ্যে গ্রীন সিগনাল জ্বলে উঠল। ড্রাইভার সাহেব হুইসাল দিয়ে টয় ট্রেন নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সায়ন্ত কি করবেন বুঝতে পারলেন না। সম্ভবত ট্রেনের বিকট শব্দের মধ্যে থাকতে থাকতে ভদ্রলোকের কান নষ্ট হয়ে গেছে। উল্টা পাল্টা জবাব দিচ্ছিলেন তাই।

ট্রেনে ওঠার জন্য লাইনে গিয়ে দাঁড়াল রাতুল, তার পেছনে সায়ন্ত।

দু ঘণ্টা পর শিশুপার্ক থেকে বের হলেন সায়ন্ত। এর মধ্যে ট্রেন জার্নি শেষ হয়েছে, সেখান থেকে স্কাই বাইক গেমস, ব্যাটারি কার, বাম্পার কার। সব জায়গাতেই এক রেজাল্ট। কেউ চেনে না রাতুলকে। তবে প্রত্যেকটা রাইডে উঠেছে রাতুল।

ক্ষুধায় পেট চো চো করছে সায়ন্তর। ঝট করে রাতুলের দিকে তাকালেন তিনি। মুখ খানা বেশ শুকিয়ে গেছে ওর। আশে পাশে কোনো ভালো খাবরের দোকান নেই। খেতে হলে এলিফেন্ট রোডে যেতে হবে। একটা রিকশা নিলেন সায়ন্ত।

খাবারের দোকানে ঢুকেই রাতুল বলল, 'আংকেল, চাইনিজ খাব আমি। অনেকদিন চাইনিজ খাই না, খুব খেতে ইচ্ছে করছে।'

ঝট করে পকেটে হাত দিলেন সায়ন্ত। সম্ভবত চায়নিজ খাওয়ার মতো টাকা নেই পকেটে। কিন্তু ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতেই কেমন যেন করে উঠল মনটা। সামান্য চায়নিজই তো খেতে চেয়েছে সে।

পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে এটিএম কার্ডটা হাতে নিলেন সায়ন্ত। ব্যাংকের একটা বুথ দেখা যাচ্ছে রাস্তার ওপাশে। রাতুলকে হোটেলের একটা সিটে বসিয়ে টাকা তুলতে গেলেন তিনি, কিন্তু ফিরে এসেই দেখেন, রাতুল নেই। ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা। দ্রুত হোটেলের বাইরে বের হয়ে তিনি আশপাশে তাকালেন। না, কোথাও নেই রাতুল!

হনহন করে হাঁটতে লাগলেন সায়ন্ত। কিন্তু পাঁচ-ছয়টা বিল্ডিং পেরুনোর পর থমকে দাঁড়ালেন। তিনজন স্কুল ড্রেস পরা ছেলের সঙ্গে তুমুল মারামারি করছে রাতুল। রাতুলকে পেটাচ্ছে ওরা আচ্ছামতো। রাস্তার ওপর একেবারে ফেলে দিয়েছে ওকে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা লাথি মারল রাতুল একজনকে। পাশের ড্রেনের পানিতে পড়ে গেল ছেলেটা। সঙ্গে সঙ্গে বাকী দুজন ঠেসে ধরল রাতুলকে, ড্রেনের পানিতে পড়ে যাওয়া ছেলেটা হঠাৎ উঠে এসে একটা খোলা কলম দিয়ে ঘা মারল রাতুলের মাথায়। মাথা সরিয়ে নিল সে, কিন্তু সম্পূর্ণ সরাতে পারল না। কপালে গেথে গেল কলমটা।

দৌড়ে এলেন সায়ন্ত। রাতুলকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল ছেলেগুলো। কপাল কেটে রক্ত বের হওয়া শুরু করেছে তার। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে চাপা দিলেন তিনি সেখানে। রাস্তার ওপাশে ব্যাংকের বুথের পাশে একটা ঔষধের দোকান দেখেছেন। দ্রুত সেখানে নিয়ে গেলেন তাকে। ডাক্তার নেই, দোকানদার নিজেই তুলো দিয়ে পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেধে দিলেন একটা, দুটো ঔষধও দিলেন খেতে।

ঔষধের দোকান থেকে বের হয়ে সায়ন্ত বললেন, 'ছেলেগুলোর সঙ্গে মারামারি করলে কেন তুমি!'

'আমি কোথায় মারামারি করলাম, আংকেল। ওরাই তো আমার সঙ্গে মারামারি করল!' কিছুটা রেগে গিয়ে বলল রাতুল।

গম্ভীর হলেন সায়ন্ত, 'ওরা তোমার সঙ্গে মারামারি করল কেন?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন!' রাতুল অবাক হওয়ার চেহারা করে বলল, 'ওরা ভিডিও গেমস খেলছিল ওই সামনের দোকানে। আমি বললাম, আমাকে একটু খেলতে দেবে। ওরা একসঙ্গে বলে কি-ভাগ! সঙ্গে সঙ্গে রাগ হয়ে গেল আমার। মানুষ তো কুকুরকেও এভাবে ভাগ বলে না!'

'তারপর?' সায়ন্ত জিজ্ঞেস করল।

'তারপর আর কি, একজনের নাকে ঘুষি মারলাম আমি। শেষে মারামারি করতে করতে রাস্তায় নেমে এলাম।' রাতুল হাসতে হাসতে বলল, 'মারামারি করতে কিন্তু ভালোই লাগছিল আমার।'

'কেন!'

'সারাদিনই তো টিভিতে রেসলিং দেখি। প্রতিদিনই ভাবি, যদি এভাবে রেসলিং করতে পারতাম। আজ মারামারি করতে করতে রেসলিংয়ের মজা পাচ্ছিলাম।' রাতুল হাসছেই।

'কলমটা যদি চোখে লাগত!'

'লাগত।'

'চোখ নষ্ট হয়ে যেত না!'

'হতো। এখন সবাই আমাকে রাতুল ডাকে, তখন ডাকত কানা রাতুল। খুব একটা খারাপ শোনাত না নামটা।'

ভাবতে লাগল সায়ন্ত। তার সামনে এখন তিনটি কাজ। এক. রাতুলকে চায়নিজ খাওয়ানো, দুই. রাতুলকে সাথে নিয়ে তার বাসা খুঁজে বের করা, তিন. বাসা খুঁজে না পেলে আজকের মতো তা স্থগিত করে রাতুলকে নিয়ে নিজের বাসায় চলে যাওয়া।

কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না সায়ন্ত। নিজে কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে পেরে রাতুলকে বললেন, 'এখন কি করা যায় বলো তো, রাতুল?'

রাতুল সায়ন্তকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'আংকেল, আপনাকে আর টেনশন করতে হবে না। বাসার ঠিকানা মনে পড়েছে আমার। আমাদের বাসা গুলশানে, গুলশান এক নম্বরে।'

রাতুলের কথা শুনে খুশি হয়ে উঠলেন সায়ন্ত। কিন্তু পরক্ষণেই খুশিটা মিলিয়ে গেল তার। গলাটা গম্ভীর করে বললেন, 'তুমি ঠিক বলছো, রাতুল?'

'জি, ঠিক বলছি।'

'দুবার কিন্তু ভুল করেছ তুমি!'

'এবার ভুল হবে না। মারামারি করার পর কপালে আঘাত পেয়ে সব কিছু মনে করতে পারছি আমি। আমাদের বাসা গুলশানে, এ ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি আমাকে গুলশানে নিয়ে চলুন।'

রাতুলের কথার মধ্যে এবার আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া খুজে পেলেন সায়ন্ত। আদর করে তার মাথায় হাত রাখতেই রাতুল বলল, 'আংকেল, যাদুঘর তো বোধহয় এই এলিফ্যান্ট রোডের মাথাতেই?'

'হ্যাঁ।'

'খুব কাছেই তো?'

'হ্যাঁ, কাছেই।'

'এত কাছেই যেহেতু এসেছি, তাহলে ওটা একটু দেখে যাই না, আংকেল! আমি কখনো যাদুঘর দেখিনি।' খুব আবদারের স্বরে বলে সায়ন্তের একটা হাত ধরল রাতুল, 'চলুন না আংকেল, প্লিজ...!'

ক্যাবের চাকাটা ঠিক হলো অবশেষে। ভাগ্যিস, পাশেই একটা ওয়ার্কশপ ছিল। তা না হলে আরো দেরি হতো। ড্রাইভার অবশ্য মিথিলাকে বলেছিল, অন্য একটা ক্যাবে চলে যেতে, তিনি যেতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেও কোনো খালি ক্যাব পাননি মিথিলা।

ক্যাবটাতে বসে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন মিথিলা। চলতে শুরু করেছে সেটা। টুনি এতক্ষণ আইসক্রিম খাচ্ছিল, টকলেট খাচ্ছিল, চিপস খাচ্ছিল, বাদাম খাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাবেই উঠেই প্রশ্ন শুরু করে দিল সে, 'মামনি, গাড়ির চাকা নষ্ট হয় কেন?'

টেনশনে ঘাড়ে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে মিথিলার। ঘাড়ে হাত দিয়ে রেখেছেন তিনি। টুনির প্রশ্ন শুনে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এতো প্রশ্ন করো না তো!'

'কেন প্রশ্ন করব না!'

'প্রশ্ন শুনতে ভালো লাগছে না।'

'কেন ভালো লাগছে না!'

মিথিলা একটু শব্দ করে বললেন, 'আহ্, চুপ করো তো টুনি।'

মায়ের ধমক খেয়ে কান্নার মতো করে টুনি বলল, 'আমাকে চুপ করতে বলছ কেন তুমি!'

মেয়ের গালে হাত বুলিয়ে দিলি মিথিলা, 'মামনি, আদর। আমি একটু টেনশনে আছি তো!'

'মামনি, টেনশন কী?'

বোবার মতো চুপ হয়ে গেলেন মিথিলা। তার আর কথা বলতে মোটেই ভালো লাগছে না। ঘাড়ে ব্যথাটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। হঠাৎ ইফতির কথা মনে হলো। ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে কল করল ওকে।

সাইবার ক্যাফে বসে কম্পিউটারে গেমস খেলছিল ইফতি। এখানকার মালিক তার পরিচিত। ইন্টারনেটে বসলে মিনিট প্রতি যা টাকা দিতে হয়, গেমস খেললেও সেই একই টাকা দেয় সে। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে ওঠায় চমকে ওঠে ইফতি। পকেট থেকে বের করে দেখে মামনির ফোন! দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে, ফোনটা রিসিভ করেই, মামনিকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, 'তুমি এখনো বাসায় আসছো না কেন, মামনি!'

'এই তো বাবা, কাজটা শেষ হলেই আসব।'

'বাসায় একা একা বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না।'

'যাও, একটু টিভি দেখো।'

'টিভিতে এখন কী দেখব!' ইফতি গলার স্বরটা কান্না কান্না করে বলল, 'কম্পিউটারে একটু গেমস খেলব সেটাও সম্ভব না। তুমি আর আব্বু মিলে সব গেমস ফেলে দিয়েছ কম্পিউটার থেকে!'

'সরি বাবা, তুমি একটা কিছু করো।' ভালো কথা—।' টুনি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে কোলের কাছে টেনে এনে মিথিলা বললেন, 'ফ্রিজ থেকে ফল খেয়েছো তো?'

'হ্যাঁ, অনেকগুলো আঙুর খেলাম তো।'

'আঙুর কোথায় পেলে! ফ্রিজে তো আঙুর নেই।'

'সরি মামনি, ভুলে গেছি। নাসপাতি খেয়েছি।'

'নাসপাতিও তো নেই। তুমি এসব কী বলছ ইফতি! তুমি এখনই ফ্রিজের কাছে যাও, দেখো, কমলা আর আপেল আছে। যেটা খেতে ইচ্ছে করে, খাও। আমি কিন্তু একটু পরেই আসছি।' ক্যাবটা মহাখালি রোডে ঢুকেছে। সেটা খেয়াল করে মিথিলা বললেন, 'বাবা, এখন রাখি। একটু পর আমি তোমাকে আবার ফোন দেব, কেমন? মোবাইলটা কাছেই রেখো।'

মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে ইফতি কম্পিউটারের দিকে তাকাল, থ্রি ডি একটা গেমস আছে এটাতে, খুব আনন্দ লাগছে খেলতে!

থানার বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে প্রায় ঝিমুনি এসে গিয়েছিল সাদাতের। মিমনি হঠাৎ বাবার হাতের ওপর একটা হাত রাখল, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন তিনি। কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গিতে সে বলল, 'স্যরি বাবা, ঘুমাচ্ছিলে!'

'না, এমনি চোখ দুটো বুজে আসছিল।' সাদাত সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কিছু বলবে?'

'বাবা, যদি আমি গণিত অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন হই, তাহলে একটা জিনিস কিনে দেবে আমাকে?' বাবার হাতটা চেপে ধরল মিমনি।

'কী জিনিস বলো?'

'একটা কম্পিউটার। আমার সব বন্ধুদের কম্পিউটার আছে, কেবল আমার নেই।' দুঃখী দুঃখী গলায় বলল মিমনি।

মেয়ের মাথায় একটা হাত রেখে সাদাত বললেন, 'কিনে দেব। গণিত অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও কিনে দেব। তুমি ওটাতে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছো, এতেই আমি খুশি, খুব খুশি।'

'বাবা, এবার তোমাকে ওই অংকটা বলি?'

'বলো।' খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন সাদাত।

মিমনি বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে খুব আনন্দ নিয়ে বলতে লাগল, 'একজন ডিম বিক্রেতার তিন ধরনের ডিম আছে—মুরগির ডিম, হাঁসের ডিম, রাজহাঁসের ডিম। প্রতিটা মুরগির ডিমের দাম ৫০ পয়সা, হাঁসের ডিমের দাম ১ টাকা, রাজহাঁসেরটা ২ টাকা। একজন ক্রেতা ২২ টাকা দিয়ে ২২টা ডিম কিনলেন।' মিমনি বাবার দিকে ভালো করে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বলল, 'তিনি কোন ডিম কয়টা কিনলেন?'

মাথার ভেতরটা এমনি জটিলতায় ভরে গেছে, এই অংকটাকে আরো জটিল মনে হলো সাদাতের। সামান্য ভেবে তিনি মাথা এদিক ওদিক করে বললেন, 'খুব জটিল মনে হচ্ছে মা, পারব না।'

'খুব সহজ, বাবা!'

'আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে।'

'একটু মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করো, উত্তরটা বের করতে পারবে।'

সাদাত হতাশার স্বরে বললেন, 'না মা, সত্যি আমি পারব না।;

মিমনি খুব উজ্জলভাবে হেসে বলল, 'মুরগির ডিম কিনেছেন ২টা, হাঁসের ডিম ১৯টা, রাজহাঁসের ১টা।' বাবার দিকে আবার তাকাল মিমনি, 'কী, খুব সহজ না?' বাবার দিকে আরো একটু ঘেঁসে বসল মিমনি, 'তোমাকে আরেকটা অংক বলি। আজব একটা দেশে গেছো তুমি। সেখানে আমাদের দেশের মতো ৫, ১০ বা ২০ টাকার নোট নেই। সেখানে আছে ১১, ১২, ৩১, ৩৩, ৪২ এবং ৪৪ টাকার নোট। ১০০ টাকার বাজার করার পর সবচেয়ে কম নোট দিয়ে দাম দেওয়ার চিন্তা করলে তুমি।' মিমনি বাবার

দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকাল, 'কয় টাকার কতটি নোট দেবে তুমি দোকানদারকে?'

এত টেনশনের মাঝেও হাসি পেল সাদাতের। অংকের প্রতি মেয়ের অসীম আগ্রহ দেখে ভীষণ খুশি হলেন মনে মনে। কিন্তু মেয়েকে হতাশ করে তিনি এবারও বললেন, 'মাথায় এখন কেনো কিছু ঢুকছে না, মা।'

'এটাও খুব সোজা।' মিমনি আগের মতোই হাসতে লাগল, '৪৪ টাকার ২টা, ১২ টাকার ১টা।' মিমনি একটু থেমে বলল, 'কী, সহজ না! দাঁড়াও, তোমাকে আরো সহজ দুটো অংক বলি। ১০০০কে একই সংখ্যা আটবার ব্যবহার করে লিখতে পারবে?'

সাদাত ছোট্ট করে বলল, 'না।'

'৮৮৮+৮৮+৮+৮+৮।' মিমনি রাজ্যজয় করার মতো হাসতে হাসতে বলল, '১ থেকে ৯ ক্রমানুসারে লিখে যোগ অথবা বিয়োগ করো, যেন রেজাল্ট ১০০ হয়?' মিমনি যথারীতি আগ্রহ নিয়ে বাবার দিকে তাকাল। সাদাতও যথারীতি আগের মতো মাথা এদিক ওদিক করল। শেষে মিমনি হাসি মুখ নিয়েই বলল, '১২৩+৪৫+৬৭+৮-৯। কী-।' মিমনি আরো একটু কাছ ঘেঁষে বলল, 'এটাও খুব সহজ না?'

সাদাত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। সামনের দিকে তাকালেন তিনি। একটা ক্যাব এসে থামল থানার সামনে।

ক্যাব থেকে নেমেই মিথিলা ফোন করল, 'হ্যালো, সাদাত সাহেব, আমি মিথিলা। চলে এসেছি আমি। থানার সামনে আছি এখন।'

'হ্যাঁ, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি আমি।' বারান্দার বেঞ্চ থেকে উঠে এগিয়ে গেলেন সাদাত। মিথিলার পাশে গিয়ে বললেন, 'আসুন, একটু তাড়াতাড়ি আসুন।' বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন সাদাত। টুনির হাত ধরে পেছন পেছন মিথিলাও এগিয়ে গেল। ওসি সারোয়ার আলীর রুমের সামনে একটা চাটাইয়ের ওপর পড়ে থাকা লাশটিকে দেখিয়ে সাদাত বললেন, 'দেখুন তো ম্যাডাম, ইনি কে?'

লাশটির দিকে ভালো করে তাকালেন মিথিলা। কিছুক্ষণ দেখার পর বললেন, 'চিনতে পারলাম না।'

'আরো একটু ভালো করে দেখুন।'

'ভালো করেই দেখেছি।'

'ইনি আপনার হাজবেন্ড না?'

মিথিলা কিছুটা শব্দ করে বললেন, 'ইনি আমার হাজবেন্ড হতে যাবে কেন!'

শব্দ শুনে ওসি সারোয়ার সাহেব বের হয়ে এলেন রুম থেকে। মিথিলাকে এক পলক দেখে বললেন, 'সত্যি এটা আপনার হাজবেন্ডের লাশ না?'

'বললাম তো না।' মিথিলা হঠাৎ কেঁদে উঠে বললেন, 'এই লোক আমার স্বামী না, একে আমি কখনো দেখিওনি।'

সারোয়ার সাহেব সাদাতের দিকে তাকালেন। তার চোখ দুটো একটু সরু করে বললেন, 'প্যাঁচটা লাগল কোথায়! লাশের এই লোকটা যদি মোবাইলের মালিক না হয়, তাহলে এর কাছে মোবাইলটা গেল কী করে! বড় যন্ত্রনার মধ্যে পড়লাম তো! আচ্ছা-।' সারোয়ার সাহেব সাদাতের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন!' বলেই তিনি আবার তার রুমে ঢুকলেন।

গাড়ি থেকে নেমেই হন্তদন্ত হয়ে থানার ভেতর যেতে লাগলেন বাসার মুন্সী। কিন্তু তার আগেই তার হাত টেনে ধরলেন নাজমা আয়েশা। গলা নিচু করে স্বামীকে বললেন, 'উত্তেজিত হবে না। যা বলবে ঠাণ্ডা মাথায় বলবে। সারেয়ার ভাই যা বলেন, মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে।'

'তুমি কি মনে করো আমি সব সময় উত্তেজিত হয়ে কথা বলি!'

'এই তো এখনই উত্তেজিত হয়ে গেছ।' স্বামীর পিঠে একটা হাত রেখে নাজমা আয়েশা বলেন, 'তুমি ভেবো না আমাদের রাতুল হারিয়ে যাওয়ার ছেলে! যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও, সচেতনও।'

দুঃখী দুঃখী চেহারা করে ওসি সারোয়ার আলীর রুমে ঢুকলেন বাসার সাহেব, সঙ্গে নাজমা আয়েশাও। তাদের দেখে ঝট করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন সারোয়ার সাহেব। হাত এগিয়ে দিয়ে হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন, 'কী দোস্ত, তোমার চেহারা তো দেখি সোমালিয়ার মানুষদের মতো হয়ে গেছে! একেবারে না খাওয়া! ভাবী—।' নাজমা আয়েশার দিকে তাকালেন সারোয়ার সাহেব, 'খেতে-টেতে দেন না নাকি আমার এ বন্ধুকে!'

নাজমা আয়েশা চেয়ারে বসে মুখে হাসি এনে বললেন, 'আপনার কি মনে হয়, সারোয়ার ভাই?'

'কিন্তু চেহারার এ অবস্থা কেন!'

'সারাক্ষণ টেনশন করে! একটুতেই অস্থির হয়ে যায়! চেহারার এ অবস্থা হবে না!'

'ছাত্র বয়স থেকেই তো ওকে দেখে আসছি, ও এরকমই।' বাসার সাহেবের দিকে তাকালেন সারোয়ার সাহেব, 'তা ছবি দুটো দাও তো বন্ধু।'

নাজমা আয়েশা তার ব্যাগ থেকে রাতুল আর জিল্লুর ছবি দুটো বের করে সারোয়ার সাহেবের হাতে দিলেন। ছবি দুটো এক পলক দেখে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন তিনি। তিনটা বাটন টিপে বললেন, 'কুরবান, আমার রুমে একটু আসো তো দেখি, দ্রুত।'

সাব ইন্সপেক্টর কুরবান আলী দ্রুতই চলে এলেন ওসি সাহেবের রুমে। তার দিকে ছবি দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সারোয়ার সাহেব বললেন, 'কুরবান-।' সামনের চেয়ারের দিকে তাকালেন সারোয়ার সাহেব, 'ইনি হচ্ছে মুন্সী গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব বাসার মুন্সী, আমার বন্ধু। আর উনি হচ্ছেন— ।' নাজমা আয়েশার দিকে তাকালেন এবার, 'বাসারের ওয়াইফ, মুন্সী গ্রুপের ডিরেক্টর।'

সালাম দিলেন কুরবান সাহেব।

'তোমার হাতে যে ছবি দুটো দিলাম তার একটা বাসারের একমাত্র ছেলে রাতুল, আরেকটা কাজের ছেলে জিল্লুর ছবি। সকালে বাসা থেকে একা বের হয়ে গেছে রাতুল, এখনো ফেরেনি। জিল্লু বাসা থেকে চুরি করে পালিয়েছে তার পরপরই। দুজনকেই খুঁজে বের করা দরকার। দ্রুত।'

'জি স্যার।'

'এখনই ঢাকার সব থানায় ছবি দুটো কপি করে পাঠিয়ে দাও। আর আমাদের থানার পক্ষ থেকে এটার দায়িত্ব নেবে তুমি নিজে।'

'জি স্যার।'

সাব ইন্সপেক্টর কুরবান আলী রুম থেকে বের হয়ে যেতেই ওসি সারোয়ার আলী বললেন, 'থানা মানেই ঝামেলা! ঝামেলা মানে কি মহা ঝামেলা! সেই সকাল থেকে একটা লাশ পড়ে আছে থানার বারান্দায়। এটা নিয়ে বেশ ঝামেলায় আছি। তা ভাবী, কফি চলে আসবে এখনই, আপনারা খেতে থাকুন। আমি একটু লাশটার ঝামেলা মিটিয়ে আসি।'

সাদাত চুপচাপ বসে আছে থানার বারান্দায়। মিথিলাকে তিনি এ পর্যন্ত তিনবার পুরো ঘটনা খুলে বলেছেন। প্রতিবার কথা শেষ হওয়ার পর মিথিলার একটাই প্রশ্ন, 'মোবাইলটা এ লোকটার হাতে আসলো কীভাবে?' প্রতিবারের মতো সাদাত কোনো উত্তর দিতে পারেনি এ প্রশ্নের, চুপ থেকেছে, এখনো চুপই আছে।

পাশের বেঞ্চিতে বসে বসে মিমনি গল্প করছে টুনির সঙ্গে, ডোরেমনের গল্প। দুটো বাক্য বলে শেষ করতেই টুনি বলে, 'তারপর?'

মিমনি আবার শুরু করে। শেষ হলে টুনি আবার বলে, 'তারপর?'

'সাদাত সাহেব—।' মিথিলা হঠাৎ সাদাত সাহেবের দিকে ঘুরে বসে বলল, 'আপনার কি কোনো কিছু সন্দেহ হয়?'

'আমি আসলে কোনো কিছু ভাবতে পারছি না, ম্যাডাম।' সাদাত দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, 'সেই সকাল থেকে বসে আছি। মানুষের উপকার করতে গিয়ে যে এমন ঝামেলায় পড়তে হবে স্বপ্নেও তা কোনোদিন ভাবিনি।'

'আমিও কিছু ভাবতে পারছি না। মাথাটা চারপাশ থেকে এমনভাবে চেপে আসছে!' মিথিলা হঠাৎ শব্দ করে বলল, 'পুলিশ তো কিছু করছে না!'

'ম্যাডাম, কে বলল করছে না!' ওসি সারোয়ার সাহেব সামনে এসে দাঁড়ালেন তাদের, 'পুলিশ তো আর রাজমিস্ত্রী না যে, ইট গেথে বিল্ডিং বানাবে, সেটা আবার মানুষের চোখে পড়বে। পুলিশের অনেক কাজ।' মিথিলার ব্যাগের দিকে তাকালেন তিনি, 'এই যে অতো বড় একটা ব্যাগ নিয়ে বাসা থেকে রাস্তায় বের হয়েছেন, ব্যাগের ভেতর টাকা-পয়সা আছে, মোবাইল আছে, আরো অনেক দামী জিনিসপত্র আছে, ব্যাগটা কিন্ত এখনো আপনার হাতেই আছে, কেউ ছিনিয়ে কিংবা কেড়ে নিয়ে যায়নি। সেটা কিন্তু এই পুলিশের জন্যই।' সারোয়ার সাহেব সাদাতের দিকে তাকালেন, 'আপনি কি বলেন, সাদাত সাহেব?'

'জি।'

'শুধু জি বলতে তো হবে না। বলুন, একদম খাঁটি কথা।'

'জি, একদম খাঁটি।'

'মানুষ শুধু পুলিশের বদনাম করে! কই, চুরি হলে, ডাকাতি হলে, খুন হলে তো মানুষ প্রথম পুলিশের কাছেই আসে। কোনো বুদ্ধিজীবী, কোনো ডাক্তার, কোনো ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যায় না। কারণ এসব ঝামলো মেটানো পুলিশের কাজ। কিন্তু-।' সারোয়ার সাহেব মুচকি হেসে বললেন, 'আপনাদের ঝামেলা তো আমি মেটাতে পারছি না। আপনারা আরো একটু বসুন। আরো কয়েকটা ঝামেলা আছে আমার হাতে।'

যাদুঘর দেখতে খুব বেশী ভালো লাগছে না রাতুলের। সায়ন্তের একটা হাত ধরে সে বলল, 'আংকেল, চলুন বের হয়ে যাই।'

সায়ন্ত অবাক হয়ে বললেন, 'কেন!'

'ভালো লাগছে না।'

'কিন্তু যাদুঘর তো আমাদের সবারই দেখা উচিত, বিশেষ করে তোমাদের।' সায়ন্ত রাতুলের কাঁধে হাত রাখলেন একটা, 'এখান থেকেই ইতিহাসের অনেক কিছু জানতে পারবে তোমরা।'

'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, আংকেল।'

'বলো।' আগ্রহ নিয়ে বললেন সায়ন্ত।

'নতুন একটা যাদুঘর বানানো উচিত আমাদের।'

'যাদুঘর তো একটা আছেই। নতুন আরেকটা দিয়ে কী হবে?' সায়ন্ত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিচে নামতে নামতে বললেন, 'সারাদেশেও কিন্তু আরো অনেক যাদুঘর আছে, বিভিন্ন ধরনের যাদুঘর আছে।'

'আমি জানি, আংকেল।' রাতুল বেশ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আমি যে যাদুঘরটার কথা ভাবছি, সেটা হবে অন্যরকম একটা যাদুঘর।'

'কী রকম?'

'একটা টিম থাকবে আমাদের। আমরা প্রতি বছর সবাই আমাদের দেশের প্রতিটি জেলায় যাব সেই টিম নিয়ে। গোপন একটা জরিপ চালাব-কে ওই এলাকার সবচেয়ে ভালো মানুষ। এরকম প্রতিটা জেলায় পাওয়া ভালো মানুষগুলো থেকে বেছে নেব আমরা সেরা ভালো মানুষটি। প্রতি বছর একজন করে নেব। তারপর আমরা ওই মানুষটির বড় একটা ছবি তুলব, সেটা লাগানো থাকবে একটা বড় ঘরের বড় দেয়ালের সঙ্গে। তিনি প্রতিদিন

কী কী কাজ করেন, তিনি কী ভালো বাসেন, দেশ নিয়ে তিনি কী ভাবেন, সব লেখা থাকবে তার ওই ছবির নিচে। প্রতিবছর বার্ষিক পরীক্ষার পর দেশের সব ছাত্র-ছাত্রী দেখতে আসবে ওই ছবিটা, পড়তে আসবে তার সম্বন্ধে লেখাগুলো। সবাই বুঝতে পারবে ভালো মানুষ হতে হলে কী করতে হয়, কী ভাবতে হয়, কীভাবে দেশকে ভালো বাসতে হয়। এভাবেই নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে ভালো মানুষ হতে থাকবে অনেকে, একদিন সমস্ত দেশ ভরে যাবে ভালো মানুষে।' রাতুল সায়ন্তের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বলল, 'আইডিয়াটা কেমন, আংকেল?'

'খুব ভালো।'

'আংকেল—।' রাতুল মাথাটা নিচু করে বলল, 'আপনিও কিন্তু একজন ভালো মানুষ।'

হাঁটতে হাঁটতে চারুকলার সামনে এসেছেন সায়ন্ত। গুলশানে যাওয়ার জন্য কোনো ক্যাব পাচ্ছেন না। চারুকলার দুটো ভাইয়া আর একটা আপু তুলি দিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মুখে বিভিন্ন নকশা এঁকে দিচ্ছেন, টাকা নিচ্ছেন। রাতুল একটা ভাইয়ার সামনে গিয়ে বলল, 'ভাইয়া, আমার সারা ফেস জুড়ে একটা মানচিত্র এঁকে দিতে পারবেন, বিশ্ব মানচিত্র।'

থানার বারান্দায় বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না মিথিলার। পাশে এসে বসেছে মিমনি, টুনিও। মিমনির একটা বই উল্টে পাল্টে দেখছে সে। মিমনি হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আন্টি, বাবা তো খাবার কিনে আনতে গেছে। বাবা আসার আগে একটা অংক বলি আপনাকে?'

মিথিলা মিমনির মাথায় হাত রেখে বললেন, 'অংক পছন্দ করো তুমি?'

'খুব। আমার মনে হয় সারাক্ষণ আমি শুধু অংক নিয়ে থাকি। কয়দিন পর গণিত অলিম্পিয়াড, আমি সিওর, আমি এবার চ্যাম্পিয়ন হবো।'

'আমিও সিওর।' মিথিলা মুখটা হাসি হাসি করে বললেন, 'তোমাদের ফোন নম্বরটা আমি নিয়ে নেব। তুমি যদি চ্যাম্পিয়ন হও, তাহলে তোমাকে স্পেশাল একটা গিফট দেব আমি।'

'থ্যাংক ইউ, আন্টি।'

'ওয়েলকাম।' মিথিলা মিমনির দিকে একটু ঘুরে বসে বলল, 'কী যেন একটা অংক বলতে চেয়েছ, বলো।'

হাতের বইটা মেলে ধরে মিমনি বলল, 'ছয় অংকের এমন একটি সংখ্যা বের করতে হবে যেটাকে ২, ৩, ৪, ৫, ৬ দিয়ে গুন করলে যে সংখ্যাগুলো তৈরি হবে সেখানে সেই অংকগুলোই থাকবে, শুধু স্থান পরিবর্তন হবে।' মিমনি মিথিলার দিকে লাজুক চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে বলতে হবে না, সংখ্যাটা আমি বলে দিচ্ছি।'

'তুমি কি মনে করো—সংখ্যাটা আমি বলতে পারব না?'

মিমনি অবাক হয়ে বলল, 'আন্টি, আপনি পারবেন!'

'হ্যাঁ।' মিথিলা গম্ভীর হয়ে বললেন, ' ১৪২৮৫৭। এটাকে ২ দিয়ে গুণ করলে হবে ২৮৫৭১৪, ৩ দিয়ে গুণ করলে ৪২৮৫৭১, ৪ দিয়ে গুণ করলে ৫৭১৪২৮, ৫ দিয়ে গুণ করলে ৭১৪২৮৫ এবং ৬ দিয়ে গুণ করলে ৮৫৭১৪২।' মিমনির মাথার চুলগুলো নেড়ে মিথিলা গম্ভীর মুখেই বললেন, 'কী, ঠিক হয়েছে?'

মিমনি হাততালি দেওয়ার মতো করে বলল, 'একদম ঠিক হয়েছে। আন্টি- ।' মিথিলার দিকে তাকাল মিমনি, 'আর একটা বলি?'

'বলো।'

বইয়ের আরেক পৃষ্ঠায় গিয়ে মিমনি বলল, 'দুই ঘরের একটি সংখ্যা, এই সংখ্যা দুটো যোগফলের তিনগুণ। সংখ্যাটি— ।'

মিমনিকে শেষ করতে দিলেন না মিথিলা, তার আগেই বললেন, '২৭।'

আগের চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে মিমনি বলল, 'কীভাবে পারলেন, আন্টি!'

'আমার এক ছেলে আছে, ইফতি। তোমার মতোই বয়স, সেও সারাক্ষণ অংক নিয়ে বসে থাকে। ওরও তোমার মতো এরকম বই আছে। একটা অংকের অ্যানসার সলভ করে, আনন্দে দৌড়ে এসে সেটা আবার আমাকে বলে। ওর অংক শুনতে শুনতে অনেকগুলো আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে!'

ইফতির কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না মিথিলার। স্কুল থেকে ফিরে বাসায় এসে কী যে করছে এখন! দুপুরের খাবার খেয়েছে কি না, ঝামেলার কারণে সে খবরও নেয়া হয়নি।

পার্স থেকে মোবাইলটা বের করলেন মিথিলা, ফোন করলেন ইফতিকে। দুবার রিং হতেই রিসিভ করল সে। মিথিলা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার ইফতি, বাইরে না কি তুমি? কেমন যেন গাড়ির শব্দ পাচ্ছি?'

বানর খেলা দেখিয়ে গাছের ওষুধ বিক্রি করছে রাস্তার পাশে একজন। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই দেখছে, ইফতিও দাঁড়িয়ে আছে এখন সেখানে। মায়ের ফোন দেখে চমকে উঠল সে। কিন্তু দ্রুত বুদ্ধি বের করে ফেলে বলল, 'না মা। আমি সেই যে স্কুল থেকে বাসায় চলে এসেছি, এখনো বাসায়ই আছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি তো, গাড়ির শব্দ পাচ্ছো তাই।'

'বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছো কেন, বাবা? তোমাকে না বলেছি, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে না বেশীক্ষণ।'

'তুমি আসছ কি না সেটা দেখার জন্যই তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি।' জবাব দিলো ইফতি। তারপর অনেকটা অভিমানের সুরে বললো, 'তুমি এখনও আসছ না কেন? যাবার আগে বললে আধা ঘন্টার মধ্যে ফিরবে। এই তোমার আধা ঘন্টা? চার-পাঁচ ঘন্টা হতে চলল প্রায়।'

মিথিলা সত্যিই ছেলের কাছে লজ্জা পেলেন, 'আমি আসছি, বাবা। একটু ঝামেলায় পড়েছি। এসে পড়ব এখনই।'

'তুমি তাড়াতাড়ি বাসায় আসো। একা একা বাসায় থাকতে আমার ভয় করছে খুব।'

'ভালো কথা-।' মিথিলা কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'তোমার বাবা কি ফোন করেছিল তোমাকে?'

'না তো, মা।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসছি।' ফোন কেটে দিলেন মিথিলা।

ফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি ক্যাব এসে দাঁড়ালো থানার বারান্দার সামনে। ক্যাব থেকে যিনি নামলেন তাকে দেখ প্রচণ্ড জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন মিথিলা-সায়ন্ত নামছে ক্যাব থেকে। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি!'

স্ত্রীর একটা হাত চেপে ধরে সায়ন্ত বললেন, 'শান্ত হও, বলছি।' সঙ্গে সঙ্গে চার প্যাকেট খাবার এনে পাশে দাঁড়ালেন সাদাত। মিথিলা চোখ দুটো মুছতে মুছতে সায়ন্তকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার হাজবেন্ড।'

হাতে কিছু কাজ ছিল, সেগুলো সেরে, রাতুল আর জিল্লুর ছবি দুটো পকেটে ঢুকিয়ে, ব্যক্তিগত ড্রয়ারটা বন্ধ করে, নিজের রুম থেকে দ্রুত বের হয়ে এলেন সাব ইন্সপেক্টর কুরবান আলী। তার চেয়েও দ্রুত থানার সামনে দাঁড়ানো গাড়িতে উঠতে নিলেন তিনি। কিন্তু এক পা উঠিয়েই থমকে গেলেন। পা নামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন একটু। আলতো করে পকেট থেকে ছবি দুটো বের করে থানার বারান্দার পাশে দাঁড়ানো রাতুলের দিকে তাকালেন। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে, ছবি দুটোর একটা বেছে নিয়ে, আরেকটা পকেটে ঢুকালেন কুরবান আলী। হাতের ছবিটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন তিনি, চোখ সরিয়ে রাতুলের দিকেও তাকালেন একবার। তারপর একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নাম কি তোমার?'

সামনে হঠাৎ পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে গেল রাতুল। মনে মনে ভাবল, মারামারি করার জন্য পুলিশ আংকেল ধরতে এসেছে কিনা তাকে! আস্তে করে সে চলে এলো সায়ন্তের পেছনে। সায়ন্ত রাতুলের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'ওর নাম রাতুল।'

'বাবার নাম বাসার মুন্সী, ঠিক?'

'জি।'

'গুলশান তিন নম্বর রোডে বাসা, ঠিক?'

'ঠিক।'

কুরবান আলী এবার ঘুরে দাঁড়ালেন সায়ন্তের দিকে। চোখ দুটো সরু করে বললেন, 'কাজটা তাহলে আপনিই করেছেন! আমরা তো রাতুলদের কাজের ছেলে জিল্লুর কথা ভেবেছিলাম শুধু!' কুরবান আলী একটু থেমে বললেন, 'তা আপনার নাম কি?'

'সায়ন্ত, সায়ন্ত সাখাওয়াত।'

'নাম শুনে তো ভদ্রলোকই মনে হচ্ছে। কিন্তু— ।' চোখ দুটো আরো সরু করলেন সাব ইন্সপেক্টর কুরবান আলী, 'তা এই লাইনে কতদিন?'

কিছুটা গম্ভীর গলায় সায়ন্ত বলল, 'এসব কী বলছেন আপনি, আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'পারবেন, সবই বুঝতে পারবেন। থানার রুমে নিয়ে রাম ডলা দিলে ফুর ফুর করে সব জিনিস আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে।' সায়ন্তকে দেখিয়ে কুরবান আলী পাশের দুজন পুলিশকে বললেন, 'এ্যারেস্ট করো একে। রাতুলকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

মিথিলা এতক্ষণ সব কিছু শুনছিলেন, চুপচাপ। সায়ন্তকে এ্যারেস্টের কথা বলতেই তিনি বেশ রাগি গলায় সাব-ইন্সপেক্টর কুরবান আলীকে হাত উঁচু করে বললেন, 'দাঁড়ান। আপনারা মানুষকে ভালোই হয়রানি করতে পারেন। আমার স্বামী মারা গেছে বলে কিছুক্ষণ আগে আমাকে থানায় ডেকে আনলেন। এখন আবার আমার স্বামীকেই এ্যারেস্ট করতে চাচ্ছেন, তাও আবার কোনো অপরাধ ছাড়াই।'

'অপরাধ করেনি মানে, আপনার স্বামী জলজ্যান্ত মানুষ কিডন্যাপ করেছে।' বললেন সাব ইন্সপেক্টর কুরবান আলী।

'অসম্ভব, আপনি কোনো কিছু না জেনে কথা বলছেন।' মিথিলা আগের চেয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কোনো কথা নেই, আপনি ওসি সাহেবকে ডাকুন।'

ওসি সারেয়ার সাহেবকে ডাকতে হলো না, শব্দ শুনে তিনি নিজেই বের হয়ে এলেন নিজের রুম থেকে, পেছনে পেছনে বাসার মুন্সী আর নাজমা আয়েশাও। রাতুলকে দেখেই নাজমা আয়েশা চিৎকার করে বললেন, 'ওই তো আমাদের রাতুল!'

ওসি সারোয়ার সাহেবের রুমে বসে আছেন সবাই। সায়ন্ত খুব নিচু স্বরে বললেন, 'কথা শুরু করার আগে এক গ্লাস পানি খেতে চাই আমি।' কোলে বসা টুনিও বলল, 'আমিও পানি খাব, বাবা।' ওসি সারোয়ার আলী পানির ব্যবস্থা করলেন, পরপর দু গ্লাস পানি খেয়ে সায়ন্ত বললেন, 'অফিসের কাজে অফিস থেকে বাইরে বের হয়েছিলাম। কিছুদুর আসার পর দেখি, মোবাইল

নেই পকেটে! তার কিছুক্ষণ আগে আমার স্ত্রী মিথিলার সঙ্গে কথা বলেছি আমি ওই মোবাইল থেকেই। বুঝে গেলাম, যা হওয়ার হয়েছে, পকেটমার নিয়ে গেছে মোবাইলটা।'

পাশে বসা সাদাত একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'দামী মোবাইল, কোমরের কাছে ভেতরের পকেটে সেটা রেখে পকেটমারটা খুব আনন্দ নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কোনো গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায় সে।'

'ঠিক সেই সময়টাতে আমি আর বাবা একটা শপিংমল থেকে বের হচ্ছিলাম।' মিমনি গলাটা গম্ভীর করে বলল, 'রাস্তার ওপাশে মানুষটাকে পড়ে থাকতে দেখে বাবা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার আংকেল বললেন, মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা তাকে এই থানায় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে পাওয়া ওই মোবাইলটা হাতে নিয়ে লাস্ট কলে মিথিলা আন্টির নামটা দেখে। বাবা ভেবেছিলেন, মৃত ওই লোকটা মিথিলা আন্টির হাজবেন্ড। তাই কোনোরকম মৃত্যুর খবর না দিয়ে আন্টিকে ডেকে আনেন এই থানায়। আন্টি এসে বলেন, ওই মৃত মানুষটা তার হাজবেন্ড না। বাবাকে অনেকক্ষণ ধরে পুলিশ আংকলেরা আটকে রেখেছেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি, সারাক্ষণ হাতের বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আর একটু পর পর বাবাকে বিভিন্ন অংকের কথা বলে মনটা ভালো করতে চাচ্ছিলাম তার।' মিমনি শব্দ করে কেঁদে উঠে বলে, 'আমার বাবা মোটেই খারাপ মানুষ না, আমার বাবা খুব ভালো মানুষ।'

সায়ন্ত মিমনির মাথাটা ধরে নিজের বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে বলল, 'আমি সরি, মামনি। সমস্ত দোষ আমার। মোবাইল চুরি হয়ে গেছে, বাসায় একটা ফোন করে আমার সেটা জানানো দরকার-এটা আমার মাথায় ছিল। কিন্তু রাস্তায় হঠাৎ রাতুলকে দেখে সব ভুলে যাই আমি। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল ও। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করতেই বলল, ওর নাকি কী একটা অসুখ আছে, দু-তিন ঘণ্টা পর পর সব কিছু ভুলে যায় সে, তার বাসা কোনটা সেটাও ভুলে গেছে সে।'

বাবা-মা'র কাছ একটু সরে গিয়ে রাতুল দ্রুত সায়ন্তের পাশে দাঁড়ায়। সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তারপর বাসা খুঁজে পাওয়ার নাম করে আংকেলকে একবার চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাই, একবার শিশুপার্কে নিয়ে যাই,

যাদুঘরে যাই, অনেক ভালো ভালো খাবার খাই, মারামারি করতে গিয়ে মাথায় আঘাত পাই। সবশেষে বাসা খুঁজেছি পেয়েছি বলে বাসায় ফিরে আসি। কিন্তু বাসায় ঢোকার আগে মনে হলো, আব্বু-আম্মু এখন বাসায় নেই, আমাকে না পেয়ে থানায় এসেছেন. শুনেছিলাম এই থানায় আব্বুর একজন বন্ধু আছেন।'

নাজমা আয়েশা কিছুটা রাগি স্বরে বললেন, 'রাতুল, তুমি মিথ্যে বলেছ কেন! তুমি তো কোনো কিছু ভুলে যাও না! ভুলেই যদি যাবে, পরীক্ষায় তুমি তাহলে ফার্স্ট হও কীভাবে!'

মাথা চুলকানোর মতো করে রাতুল বলল, 'পরীক্ষার আগে বিজ্ঞান স্যার বলেছিলেন, আমাদের দেশে নাকি কোনো ভালো মানুষ নেই। আজ একটা ভালো মানুষের খোঁজে বের হয়েছিলাম তাই। ওরকম একটা মিথ্যা কথা না বললে সায়ন্ত আংকেল আমার বাসা খুঁজে দেয়ার জন্য আমার কথা মতো একবার চিড়িয়াখানা, একবার শিশুপার্ক নিয়ে যাবেন কেন? নিজের ছেলের মতো আমাকে যত্ন করবেন কেন, আদর করবেন কেন, যা খেতে চেয়েছি তাই কিনে দেবেন কেন? বিজ্ঞান স্যার ভুল বলেছেন, দেশে এখনো অনেক ভালো মানুষ আছে। খুঁজতে বের হয়েছিলাম একজন, পেয়ে গেলাম দুজন-সায়ন্ত আংকেল, সাদাত আংকেল। আম্মু—।' নাজমা আয়েশার দিকে এগিয়ে যায় রাতুল। মায়ের কাঁধে একটা মাথা রেখে বলে, 'আমি একটা যাদুঘর বানাব, সব ভালো মানুষের ছবি থাকবে সেই যাদুঘরে। প্রথম দুটো ছবি থাকবে সায়ন্ত আংকেল আর সাদাত আংকেলের।'

'তোমার ছবি থাকবে না?' মিমনি হাসতে হাসতে বলল।

'সেটা বলতে পারছি না, তবে তোমার ছবি থাকবে।' রাতুলও হাসতে হাসতে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুটো বন্ধুও পেয়েছি আমি-মিমনি আর টুনি।' রাতুল একটু থেমে বলল, 'আমি যখন বুঝে গেলাম সায়ন্ত আংকেল সত্যি একজন ভালো মানুষ, তখনই মনে হলো বিশ্ব জয় করে ফেলেছি আমি। নিজের মুখে তাই বিশ্বের মানচিত্রটা এঁকে নিলাম!' মায়ের পাশ থেকে সরে এলো রাতুল। সায়ন্ত আর সাদাতের হাত ধরে, সেই হাত দুটোকে নিজের গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে, দু চোখ ছলছল করে বলল, 'আমিও আপনাদের মতো ভালো মানুষ হতে চাই, আংকেল! খুব ভালো মানুষ!'

প্যান্টের পকেট থেকে সবগুলো টাকা বের করল ইফতি। তার কাছে যা ছিল, আর আম্মুর আলামারি থেকে যে কয়টা নিয়েছিল, বাসা থেকে বের হওয়ার পর তার প্রায় সবগুলোই এরই মধ্যে শেষ করে ফেলেছে সে। গুনে দেখল, আর অল্প কিছু আছে। বাসায় ফিরছিল, কিন্তু রাস্তার পাশে কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গেল সেদিকে। সামনের একটা সাদা বোর্ডের সঙ্গে অনেকগুলো ছোট ছোট বেলুন ফুলিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছে, লম্বা একটা বন্দুকের গুলি দিয়ে সেই বেলুনগুলো ফুটাচ্ছে একজন। এরপর আরো দুজন ফুটালেন, তারপর বেলুনওয়ালাকে বন্দুক ফেরত দিলেন তারা, টাকাও দিলেন বেশ কয়েকটা।

বন্দুক হাতে লোকটি ইফতিকে দেখে বললেন, 'বেলুন ফুটাবে?'

ইফতি ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'কত টাকা?'

বেলুনওয়ালা বললেন, 'প্রতি গুলি একটা টাকা।'

'যদি আমি গুলি করে বেলুন ফুটাতে না পারি?'

'তবুও টাকা দিতে হবে, এক গুলি এক টাকা।' বন্দুকটা ইফতির হাতে প্রায় জোর করে দিয়ে লোকটি বললেন, 'ফুটানোর চেষ্টা করো না!' তারপর বন্দুকটা কীভাবে ধরতে হবে সেটা শিখিয়ে দিলেন তাকে। বন্দুকটা পজিশন করতেই লোকটি ইফতিকে আবার বললেন, 'তোমার কাছে টাকা আছে তো?'

বন্দুকটা পজিশন থেকে নামিয়ে পকেটে হাত দিল ইফতি। সবগুলো টাকা বের করে লোকটাকে দিতেই গুনে তিনি বললেন, 'তের টাকা আছে, তের বার গুলি করতে পারবে তুমি।'

খুব দ্রুত তেরটা গুলি ব্যবহার করে ফেলল ইফতি, কিন্তু বেলুন ফুটাতে পারল মাত্র চারটা। বেলুনওয়ালা লোকটি বললেন, 'আরো গুলি করবে?'

'গুলি করব কীভাবে, আর তো টাকা নেই।'

ইফতির হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে লোকটি বললেন, 'তাহলে বাসা থেকে টাকা এনে আবার এসো।'

প্যান্টের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে বাসায় ফিরতে লাগল ইফতি। ভীষণ ভালো লাগছে আজ, খুব আনন্দ করেছে আজ সে। বাসা যদিও খুব দূরে নয়, তবুও একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে এখন। কারণ যেকোনো সময়, যেকোনো মুহূর্তে আম্মু চলে আসতে পারে বাসায়।

সায়ন্ত, মিথিলা, টুনি বেশ কিছুক্ষণ আগে একটা ক্যাবে উঠেছেন। সারাদিন তাদের দুজনের মধ্যে যে চিন্তা আর টেনশন ছিল, এখন আর নেই তা। বরং তারা এখন বেশ হাসিখুশি।

টুনি আবার প্রশ্ন করা শুরু করেছে। মিথিলা আর সায়ন্ত পালা করে উত্তর দিচ্ছেন তার। বিরক্ত লাগছে না এখন আর কোনো কিছুতেই।

ক্যাবটা বাসার সামনে এসে থামল। মিথিলা দেরি করলেন না। ক্যাব থেকে নেমে সোজা দরজার সামনে এসে কলিংবেলে হাত রাখলেন। টুনির হাত ধরে পাশে দাঁড়িয়ে আছে সায়ন্তও।

বেলের শব্দ শুনে নিজের চেহারায় একটা দুঃখী দুঃখী ভাব আনল ইফতি। কলিংবেল একবার বেজেছে, আরেকবার বাজার অপেক্ষায় রইল। দ্বিতীয়বার বাজল। চেহারাটা আরো দুঃখী দুঃখী করে দরজার সামনে এগিয়ে গেল সে। তারপর খুলে দিল দরজাটা। মাকে দেখে প্রচণ্ড চিৎকার করে ইফতি বলল, 'এত দেরি করলে কেন তোমরা! বাসায় সারাদিন একা একা থাকতে আমার ভয় লাগে না বুঝি।'

ইফতির কষ্টে চোখে পানি এসে গেল মিথিলার। অপরাধ বোধ কাজ করছে তার মনের মধ্যে, বুকের ভেতরটাও কেমন যেন করছে। সামনে দাঁড়ানো ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি শক্ত করে।

কান্নার মতো শব্দ করে উঠল ইফতি এবার। মা'র কাঁধে মুখ গুজে মনে মনে কিছুটা শংকিতও হলো—ঠিক মতো হচ্ছে তো অভিনয়টা!